মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ



স্বামী বিবেকানন্দ

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ

ষষ্ঠ সংস্করণ

পৌষ, ১৩৪৫

উদ্বোধন কার্য্যালয়

বাগবাজার, কলিকাতা

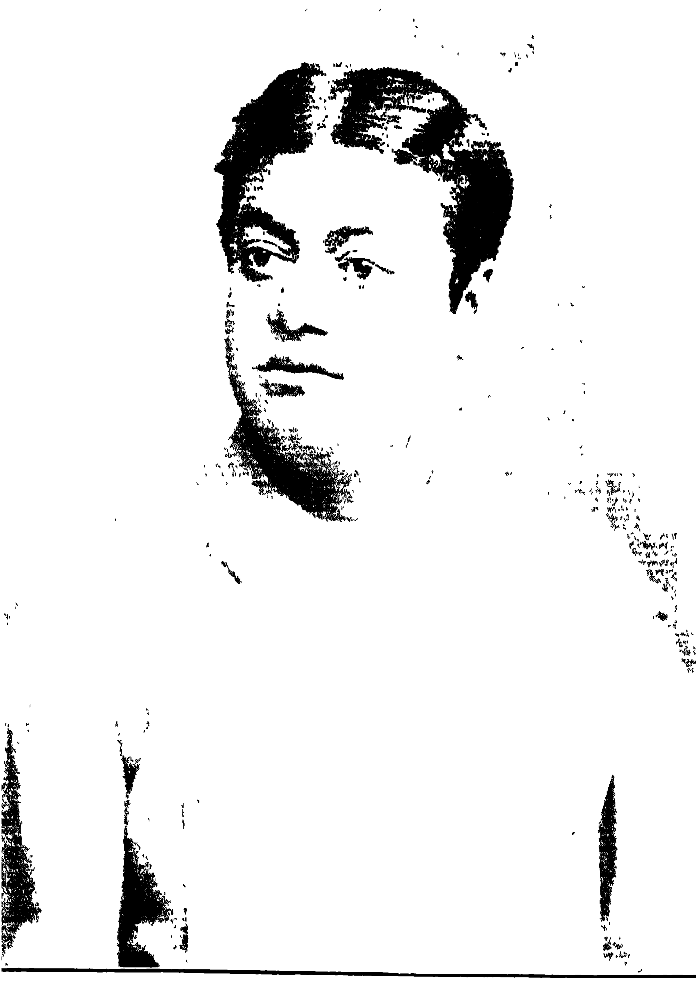
[মূল্য ॥৶০ মাত্র

প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্য্যালয়,
১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৪৪ (৫০০০)
ষষ্ঠ সংস্করণ—পৌষ, ১৩৪৫ (৭০০০)

প্রিণ্টার—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে,
এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স
২০এ, গৌর লাহা   ট, কলিকাতা

সূচীপত্র



মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

রামায়ণ

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনা নামক স্থানে "সেক্সপিয়র সভায়" প্রদত্ত বক্তৃতা

সংস্কৃত ভাষায় শত শত মহাকাব্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে দুইখানি অতি প্রাচীন ও বিপুলকলেবর। যদিও প্রায় দুই সহস্র বর্ষের উপর হইল সংস্কৃত আর কথোপকথনের ভাষা নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সেই প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে। আমি আপনাদের সমক্ষে সেই রামায়ণ ও মহাভারত নামক অতি প্রাচীন কাব্যদ্বয়ের বিষয় বলিতে যাইতেছি। ঐগুলির মধ্যে প্রাচীন ভারতবাসিগণের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। ঐ দুইটীর মধ্যে আবার রামায়ণ প্রাচীনতর—উহাকে রামের জীবন চরিত বলা যায়। রামায়ণের পূর্ব্বেও ভারতে পদ্য-সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। হিন্দুদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের অধিকাংশ ভাগ একপ্রকার ছন্দে রচিত; কিন্তু এই রামায়ণ গ্রন্থখানিই ভারতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আদিকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

রামায়ণের কবির নাম মহর্ষি বাল্মীকি। পরবর্ত্তী কালে অপরের রচিত অনেক কাব্যাত্মক আখ্যায়িকা ঐ প্রাচীন কবি বাল্মীকির

রচিত বলিয়া উহাদের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছিল। শেষে এমন দেখা যায় যে, অনেক শ্লোক বা কবিতা তাঁহার রচিত না হইলেও সেগুলি তাঁহারই রচিত বলিয়া জ্ঞান করা একটা প্রচলিত প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল প্রক্ষিপ্তাংশ থাকিলেও আমরা এখন উহা যে আকারে পাইতেছি, তাহাও অতি সুন্দরভাবে গ্রথিত—জগতের সাহিত্যে উহার তুলনা নাই।

অতি প্রাচীন কালে এক স্থানে জনৈক যুবক বাস করিত—সে কোনরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে পারিত না। তাহার শরীর অতিশয় দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল। আত্মীয়বর্গের ভরণপোষণের উপায়ান্তর না দেখিয়া সে অবশেষে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেই সে তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং ঐ দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধনদ্বারা পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাদির ভরণপোষণ করিত। এইরূপে বহুদিন যায়—দৈবক্রমে একদিন দেবর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন; দস্যু তাঁহাকে দেখিবামাত্র আক্রমণ করিল। দেবর্ষি দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কি জান না, দস্যুতা ও নরহত্যা মহাপাপ? তুমি কিজন্য আপনাকে এই পাপের ভাগী করিতেছ?" দস্যু উত্তরে বলিল, "আমি এই দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধনদ্বারা আমার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকি।" দেবর্ষি বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, তুমি যাহাদের জন্য এই ঘোর পাপাচরণ করিতেছ তাহারা তোমার এই পাপের ভাগ লইবে?" দস্যু বলিল, "নিশ্চয়ই—তাহারা অবশ্যই আমার পাপের ভাগ গ্রহণ করিবে।" তখন দেবর্ষি বলিলেন,

"আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর। তুমি আমাকে এখানে বাঁধিয়া রাখিয়া যাও—তাহা হইলে আমি আর পালাইতে পারিব না। তার পর তুমি বাড়ী গিয়া পরিবারবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস দেখি, তাহারা যেমন তোমার ধনের ভাগ গ্রহণ করে, তদ্রূপ তোমার পাপের ভাগ গ্রহণে প্রস্তুত কি না।" দস্যু দেবর্ষির বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে সেই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে পঁহুছিয়াই প্রথমে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, আমি কিরূপে আপনাদের ভরণপোষণ করি, তাহা কি আপনি জানেন?" পিতা উত্তর দিল, "না আমি জানি না।" তখন পুত্র বলিল, "আমি দস্যুবৃত্তি দ্বারা আপনাদের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। আমি লোককে মারিয়া ফেলিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করি।" পিতা এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্ত-নয়ন হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি? তুই এইরূপে ঘোরতর পাপাচরণে লিপ্ত থাকিয়াও আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিস্—এখনই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ—তুই পতিত—তোকে আজ হইতে ত্যাজ্য পুত্র করিলাম।" তখন দস্যু তাহার মাতার সমীপে গিয়া তাহাকেও পিতার ন্যায় প্রশ্ন করিল। সে কিরূপে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করে, তৎসম্বন্ধে মাতাও পিতার ন্যায় নিজ অজ্ঞতা জানাইলে দস্যু তাহাকে নিজের দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। মাতা ঐ কথা শুনিবামাত্র ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল—"উঃ কি ভয়ানক কথা!" দস্যু তখন কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "শোন মা, স্থির হও। ভয়ানকই হউক আর যাহাই হউক—তোমাকে একটা

কথা জিজ্ঞাস্য আছে—তুমি কি আমার পাপের ভাগ লইবে ?" মাতা তখন যেন দশ হাত পিছাইয়া অম্লানবদনে বলিল, "কেন, আমি তোর পাপের ভাগ লইতে যাইব কেন ? আমি ত কখন দস্যুবৃত্তি করি নাই।" তখন সে তাহার পত্নীর নিকট গমন করিয়া তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। বলিল, "শুন, প্রিয়ে, আমি একজন দস্যু ; অনেক কাল ধরিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া লোকের অর্থাপহরণ করিতেছি, আর সেই দস্যুবৃত্তিলব্ধ অর্থদ্বারাই তোমাদের সকলের ভরণপোষণ করিতেছি ; এখন আমার জিজ্ঞাস্য—তুমি কি আমার পাপের অংশ লইতে প্রস্তুত ?" পত্নী মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই উত্তর দিল, "কখনই নহে। তুমি আমার ভর্ত্তা—তোমার কর্ত্তব্য আমার ভরণপোষণ করা। তুমি যেরূপেই আমার ভরণ-পোষণ কর না কেন, আমি তোমার পাপের ভাগ কেন লইব ?"

দস্যুর তখন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। সে ভাবিল, "এই ত দেখিতেছি সংসারের নিয়ম ! যাহারা আমার পরম আত্মীয়, যাহাদের জন্য আমি এই দস্যুবৃত্তি করিতেছি, তাহারা পর্য্যন্ত আমার পাপের ভাগী হইবে না।" এই ভাবিতে ভাবিতে সে দেবর্ষিকে যেখানে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, তথায় উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে তাঁহার বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া বাটীর কথা আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিল। পরে সে কাতর ভাবে তাঁহার নিকট বলিল, "প্রভো, আমায় উদ্ধার করুন—আমি কি করিব বলিয়া দিন।" তখন দেবর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস, তুমি এই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ কর। তুমি ত দেখিলে, পরিবারবর্গের মধ্যে কেহই তোমায় যথার্থ ভালবাসে

না—অতএব ঐ সকল পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন? যতদিন তোমার ঐশ্বর্য্য থাকিবে ততদিন তাহারা তোমার অনুগত থাকিবে—আর যে দিন তুমি কপর্দ্দকহীন হইবে, সেই দিনই উহারা তোমায় পরিত্যাগ করিবে। সংসারে কেহই কাহারও দুঃখ কষ্ট বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, কিন্তু সকলেই সুখের বা পুণ্যের ভাগী হইতে চায়। অতএব তুমি তাঁহারই উপাসনা কর, একমাত্র যিনি সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, সকল অবস্থায়ই আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তিনি কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, কারণ যথার্থ ভালবাসায় বিনিময় নাই, স্বার্থপরতা নাই, যথার্থ ভালবাসা অহেতুক।"

এই সকল কথা বলিয়া দেবর্ষি তাহাকে সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। দস্যু তখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক গভীর অরণ্যে গিয়া দিবারাত্র সাধনভজন ও ধ্যানে নিযুক্ত হইল। ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে দস্যুর দেহজ্ঞান এতদূর লুপ্ত হইল যে, তাহার দেহ বল্মীকস্তূপে সংলগ্ন হইয়া গেলেও সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। অনেক বর্ষ এইরূপে অতিক্রান্ত হইলে দস্যু শুনিল, কে যেন গম্ভীরকণ্ঠে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "মহর্ষে, উঠ।" দস্যু চমকিত হইয়া বলিল, "মহর্ষি কে? আমি ত দস্যুমাত্র।" সেই বাণী আবার গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "তুমি এখন আর দস্যু নহ। তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়াছে—তুমি এখন মহর্ষি। আজ হইতে তোমার পুরাতন নাম লুপ্ত হইল। এখন তুমি 'বাল্মীকি' নামে প্রসিদ্ধ হইবে—যেহেতু তুমি ধ্যানে এত গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়াছিলে যে,

তোমার দেহের চতুষ্পার্শ্বে যে বল্মীকস্তূপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য কর নাই।" এইরূপে সেই দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হইল।

এই মহর্ষি বাল্মীকি কিরূপে কবি হইলেন, এক্ষণে সেই কথা বলিতেছি। একদিন মহর্ষি পবিত্র ভাগীরথীসলিলে অবগাহনার্থ যাইতেছেন, দেখিলেন এক ক্রৌঞ্চমিথুন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহর্ষি ক্রৌঞ্চমিথুনের দিকে একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলেন, তাহাদের আনন্দ দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই এই আনন্দদৃশ্য শোকদৃশ্যে পরিণত হইল—কোথা হইতে একটা তীর তাঁহার পার্শ্ব দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল—পুংক্রৌঞ্চটি সেই তীরবিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তাহার দেহ ভূমিতে পতিত হইবামাত্র ক্রৌঞ্চবধূ পরম দুঃখিতান্তঃকরণে তদীয় পতির মৃতদেহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহর্ষির অন্তর এই শোকদৃশ্য দর্শনে পরম করুণার্দ্র হইল—তিনি, এই নিষ্ঠুর কর্ম্মের কর্ত্তা কে, জানিবার জন্য ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিবামাত্র এক ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন।

তখন তাঁহার মুখ হইতে এই শ্লোক নির্গত হইল :—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং ॥

তিনি বলিলেন, "রে ব্যাধ! তুই কি পাষণ্ড, তোর একবিন্দুও দয়ামায়া নাই! ভালবাসার খাতিরেও তোর নিষ্ঠুর হস্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও হত্যাকার্য্যে বিরত নহে!"

শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়াই মহর্ষির মনে উদয় হইল, "এ কি? এ আমি কি বলিতেছি! আমি ত কখন এমন ভাবে কিছু বলি নাই।" তখন তিনি এক বাণী শুনিতে পাইলেন—"বৎস, ভীত হইও না—তোমার মুখ হইতে এই যাহা বাহির হইল, ইহার নাম কবিতা। তুমি জগতের হিতের জন্য কবিতায় রামের চরিত বর্ণনা কর।" এইরূপে প্রথম কবিতার সৃষ্টি হইল। প্রথম কবি বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম শ্লোক করুণাবশে স্বতঃ নির্গত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি পরম মনোহর কাব্য রামায়ণ অর্থাৎ রামচরিত রচনা করিলেন।

ভারতে অযোধ্যানাম্নী এক নগরী ছিল—উহা এখনও বর্ত্তমান। ভারতের যে প্রদেশে ঐ নগরীর এখনও স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাকে আউধ বা অযোধ্যা প্রদেশ বলে এবং আপনারাও অনেকে ভারতের মানচিত্রে ঐ প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উহাই সেই প্রাচীন অযোধ্যা। অতি প্রাচীনকালে তথায় দশরথ নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তিন রাণী ছিল—কিন্তু কোন রাণীর গর্ভেই রাজার কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। তাই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর আচারের অনুবর্ত্তী হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীগণ সন্তানকামনায় ব্রতোপবাস দেবারাধন প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহাদের চারিটি পুত্র জন্মিল—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম। ক্রমে এই রাজপুত্রগণ যথাবিধানে সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন।

জনক নামে আর একজন রাজা ছিলেন—তাঁহার সীতা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। সীতাকে একটি শস্যক্ষেত্রে

মধ্যে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল—অতএব সীতা পৃথিবীর কন্যা ছিলেন—তাঁহার অন্য জনকজননী ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃতে 'সীতা' শব্দের অর্থ হলকৃষ্ট ভূমিখণ্ড—তাঁহাকে ঐরূপ স্থানে কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার তথাবিধ নামকরণ হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে ঐরূপ অলৌকিক জন্মের কথা অনেক পড়া যায়। কাহার পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন না; কাহারও মাতা ছিলেন, পিতা ছিলেন না। কাহারও বা পিতামাতা কেহই ছিলেন না, কাহারও বা যজ্ঞকুণ্ড হইতে জন্ম, কাহারও আবার শস্যক্ষেত্রে জন্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি—চলিত কথায় যেমন বলে ভুঁইফোড়।

সীতা পৃথিবীর দুহিতা বলিয়া নিষ্কলঙ্কা ও পরম শুদ্ধস্বভাবা ছিলেন। রাজর্ষি জনকের দ্বারা তিনি প্রতিপালিতা হন। তাঁহার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম হইলে রাজর্ষি তাঁহার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভারতে প্রাচীনকালে "স্বয়ম্বর" নামক এক প্রকার বিবাহ-প্রথা ছিল—তাহাতে রাজকন্যাগণ স্ব স্ব পতি নির্ব্বাচন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্নদেশীয় রাজপুত্রগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সকলে সমবেত হইলে রাজকন্যা বহুমূল্য বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইয়া বরমাল্য হস্তে সেই রাজপুত্রগণের মধ্য দিয়া গমন করিতেন—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একজন নকিব যাইত—সে তাঁহার পাণিপীড়নার্থী প্রত্যেক রাজকুমারের গুণাগুণ বংশমর্য্যাদাদি কীর্ত্তন করিত। রাজকন্যা যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন তাঁহারই গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে

পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এই সকল স্বয়ম্বরস্থলে কখন কখন ভাবী বরের বিদ্যাবুদ্ধিবল পরীক্ষার্থে বিশেষ বিশেষ পণ নির্দ্দিষ্ট থাকিত।

অনেক রাজপুত্র সীতার পাণিপীড়নে সমুৎসুক ছিলেন। 'হর-ধনুঃ' নামক এক প্রকাণ্ড ধনুঃ যে ভগ্ন করিতে পারিবে, সীতা তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, এ স্বয়ম্বরে ইহাই পণ ছিল। সকল রাজপুত্রই এই বীর্য্যপরিচায়ক কর্ম্মসম্পাদনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে রাম ঐ দৃঢ় ধনুঃ হস্তে লইয়া অবলীলাক্রমে উহা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। হরধনুঃ ভগ্ন হইলে সীতা রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। মহামহোৎসবের সহিত রাম-সীতার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রাম বধূকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন।

কোন রাজার অনেকগুলি পুত্র থাকিলে রাজার দেহান্তে যাহাতে সিংহাসন লইয়া রাজকুমারগণের মধ্যে বিরোধ না হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রাচীন ভারতে রাজার জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্রের উদ্বাহক্রিয়া সমাপনান্তে রাজা দশরথ ভাবিলেন, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, রামও আমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমগ্র অযোধ্যা এই অভিষেক-সংবাদে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে প্রিয়তমা রাজমহিষী কৈকেয়ীর জনৈকা পরিচারিকা

তদীয় স্বামিনীকে বহুকাল পূর্ব্বে রাজা কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত দুইটি বরদানের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। এক সময়ে কৈকেয়ী রাজা দশরথের এতদূর সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কোন দুইটি বিষয় প্রার্থনা কর, যদি তাহা আমার সাধ্যাতীত না হয়, আমি তোমাকে তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিব।" কিন্তু কৈকেয়ী তখন রাজার নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি ঐ বরের কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ দুষ্টস্বভাবা দাসী তাঁহাকে এক্ষণে বুঝাইতে লাগিল, রাম সিংহাসনে বসিলে তাঁহার কি ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? বরং তাঁহার পুত্র রাজা হইলে তাঁহার সব সুখ। এইরূপে সে কৈকেয়ীর হিংসাবৃত্তি উত্তেজিত করিতে লাগিল। দাসীর পুনঃপুনঃ মন্ত্রণায় রাণীর হৃদয়ে প্রবল ঈর্ষার উদ্রেক হইল, তিনি অবশেষে ঈর্ষাবশে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। তখন সেই দুষ্টা, রাজার বরদানাঙ্গীকারের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল, "এই সেই অঙ্গীকৃত বরপ্রার্থনার উপযুক্ত সময়। তুমি এক বরে তোমার পুত্রের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস প্রার্থনা কর।"

বৃদ্ধ রাজা রামচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। এদিকে কৈকেয়ী যখন রাজার নিকট ঐ দুইটি কুৎসিত বর প্রার্থনা করিলেন, তখন রাজা বুঝিলেন, তিনি রাজা হইয়া কখন নিজ সত্যভঙ্গ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাম আসিয়া তাঁহাকে এই উভয় সঙ্কট হইতে

রক্ষা করিলেন। রাম পিতৃসত্য-রক্ষার জন্য স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্যত্যাগ করিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন। এইরূপে রাম চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনগমন করিলেন—সঙ্গে প্রিয়তমা পত্নী সীতা ও প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ গমন করিলেন—ইঁহারা কোন মতে রামের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না।

আর্য্যগণ সে সময় ভারতের গভীর অরণ্যের অধিবাসিগণের সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন না। তখন তাঁহারা বন্য জাতিগণকে "বানর" নামে অভিহিত করিতেন। আর এই তথাকথিত "বানর" অর্থাৎ অসভ্য বন্যজাতিগণের মধ্যে যাহারা অতিশয় বলবান ও শক্তিশালী হইত, তাহারা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক "রাক্ষস" নামে অভিহিত হইত।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণ দ্বারা অধ্যুষিত অরণ্যে গমন করিলেন। যখন সীতা রামের সহিত যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন রাম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি রাজকন্যা হইয়া কিরূপে এই সকল কষ্ট সহ্য করিবে—অরণ্যে কখন কি বিপদ উপস্থিত হইবে, কিছুই জানা নাই। তুমি কিরূপে তথায় আমার সঙ্গে যাইবে?" সীতা তাহাতে এই উত্তর দেন, "আর্য্যপুত্র যথায় যাইবেন, সীতাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। আপনি আমাকে 'রাজকন্যা' 'রাজবংশে জন্ম' এসব কথা কি বলিতেছেন! আমায় আপনাকে সঙ্গে লইতেই হইবে।" রামচন্দ্রকে অগত্যা সীতাকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। আর রামগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণও রামের মুহূর্ত্তমাত্র বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং তিনিও কোনমতে রামের সঙ্গ ছাড়িলেন না।

তাঁহারা অরণ্যমধ্যে গমন করিয়া প্রথমে চিত্রকূটপর্ব্বতে কিছুদিন বাস করিলেন। পরে গভীর হইতে গভীরতর অরণ্যে গমন করিয়া গোদাবরীতীরবর্ত্তী পরম রমণীয় পঞ্চবটী প্রদেশে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে মৃগয়া করিতেন ও ফলমূল আহার করিতেন—তাহাতে তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। এইরূপে কিছুকাল বাস করিবার পর একদিন তথায় এক রাক্ষসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী। যদৃচ্ছাক্রমে অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে সে রামের দর্শন পাইল এবং তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রেমা-কাঙ্ক্ষিণী হইল। কিন্তু রাম মনুষ্যগণমধ্যে পরম শুদ্ধস্বভাব ছিলেন এবং তিনি বিবাহিত; সুতরাং রাক্ষসীর মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। রাক্ষসী প্রতিহিংসাপরবশা হইয়া তদীয়া ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গিয়া রামভার্য্যা পরমাসুন্দরী সীতার বিষয় তাঁহাকে সমুদয় বিজ্ঞাপিত করিল।

মর্ত্ত্যগণের মধ্যে রাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান্ ছিলেন। রাক্ষস, দৈত্য, দানব, কাহারও এত শক্তি ছিল না যে, বাহুবলে রামকে পরাস্ত করিবে। সুতরাং সীতাহরণার্থ রাবণকে মায়া অব-লম্বন করিতে হইল। সে অপর একটি রাক্ষসের সহায়তা গ্রহণ করিল —উক্ত রাক্ষস পরম মায়াবী ছিল। রাবণের অনুরোধে সে সুবর্ণমৃগ-রূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের নিকট মনোহর নৃত্য, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। সীতা ঐ মায়ামৃগের রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং তাঁহার জন্য ঐ মৃগটিকে ধরিয়া আনিবার জন্য রামকে অনুরোধ করিলেন। রাম লক্ষ্মণকে সীতার

রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মৃগকে ধরিবার জন্য বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মণ তখন কুটীরের চতুর্দ্দিকে একটী মন্ত্রপূত গণ্ডি কাটিয়া সীতাকে বলিলেন, "দেবী, আমার বোধ হইতেছে—অদ্য আপনার কিছু অশুভ ঘটিতে পারে। অতএব আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনি অদ্য কোনক্রমে এই মন্ত্রপূত গণ্ডির বাহিরে যাইবেন না।" ইতিমধ্যে রাম সেই মায়ামৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন; সেই মৃগও তৎক্ষণাৎ তাহার স্বাভাবিক রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

ঠিক সেই সময়ে কুটীরে এক গভীর আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল —যেন রাম চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "লক্ষ্মণ, ভাই, এস—আমায় রক্ষা কর।" সীতা শুনিয়া অমনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি অবিলম্বে বনমধ্যে গমন করিয়া আর্য্যপুত্রের সাহায্য কর।" লক্ষ্মণ বলিলেন—"এ ত রামচন্দ্রের স্বর নহে।" কিন্তু সীতার বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে রামের অন্বেষণে যাইতে হইল। লক্ষ্মণ যেমন বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়াছেন, অমনি রাক্ষসরাজ রাবণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কুটীর সম্মুখে আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। সীতা বলিলেন, "আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন—আমার স্বামী এখনই ফিরিবেন—তিনি আসিলেই আমি আপনাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দিব।" সন্ন্যাসী বলিল, "শুভে, আমি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত—অতএব কুটীরে যাহা কিছু আছে এখনই আমাকে তাহা প্রদান কর।" সীতা এই কথায় আশ্রমে যে কয়েকটি ফলমূল ছিল, তাহা আনিয়া গণ্ডির ভিতরে থাকিয়াই সন্ন্যাসীকে তাহা লইতে বলিলেন। কিন্তু কপট

সন্ন্যাসী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল—সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহার ভয়ের কোন কারণ নাই, অতএব গণ্ডি লঙ্ঘন করিয়া তাহার নিকট আসিয়া অনায়াসে তিনি ভিক্ষা দিতে পারেন। সন্ন্যাসীর পুনঃ পুনঃ উত্তেজনায় সীতা যেমন গণ্ডির বাহির হইয়াছেন, অমনি সেই কপট সন্ন্যাসী নিজ রাক্ষসদেহ পরিগ্রহ করিয়া সীতাকে বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক ধারণ করিল এবং নিজ মায়ারথ আহ্বান করিয়া তাহাতে রোরুদ্যমানা সীতাকে বলপূর্ব্বক বসাইয়া তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল। আহা! সীতা তখন নিতান্ত নিঃসহায়া—এমন কেহ সেখানে ছিল না যে আসিয়া তাঁহার সাহায্য করে। যাহা হউক, রাবণের রথে যাইতে যাইতে সীতা নিজ অঙ্গ হইতে কয়েকখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাবণ সীতাকে তাহার নিজ রাজ্য লঙ্কায় লইয়া গেল। সে সীতাকে তাহার মহিষী হইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তাহার বাক্যে সম্মত করিবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। কিন্তু সীতা সতীত্বধর্ম্মের সাকার বিগ্রহস্বরূপা ছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। রাবণ সীতাকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে, যতদিন না তিনি তাহার পত্নী হইতে অঙ্গীকৃত হন, ততদিন তাঁহাকে দিবারাত্র এক বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করিলেন।

যখন রাম লক্ষ্মণ কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তথায় সীতা নাই, তখন তাঁহাদের শোকের আর সীমা রহিল না। সীতার কি দশা হইল, তাঁহারা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া চারিদিকে সীতার অন্বেষণ করিতে

লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কোনই উদ্দেশ পাইলেন না। অনেক দিন এইরূপ অনুসন্ধানের পর এক দল 'বানরের' সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল—তাহাদের মধ্যে দেবাংশসম্ভূত হনুমানও ছিলেন। আমরা পরে দেখিব, এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ রামের পরম বিশ্বস্ত অনুচর হইয়া সীতা-উদ্ধারে রামকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। রামের প্রতি তাঁহার ভক্তি এত প্রবল ছিল যে, হিন্দুগণ এখনও তাঁহাকে প্রভুর আদর্শ-সেবকরূপে পূজা করিয়া থাকেন। আপনারা দেখিতেছেন 'বানর' ও 'রাক্ষস' শব্দে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন অধিবাসিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এইরূপে অবশেষে 'বানরগণের' সহিত রামের মিলন হইল। তাহারা তাঁহাকে বলিল যে, তাহারা আকাশ দিয়া একখানি রথ যাইতে দেখিয়াছিল, তাহাতে একজন 'রাক্ষস' বসিয়াছিল—সে এক রোরুদ্যমানা পরমা সুন্দরী রমণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, আর যখন রথখানি তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া যায়, তখন সেই রমণী তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজগাত্র হইতে একখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাদের নিকট ফেলিয়া দেন। এই বলিয়া তাহারা রামকে সেই অলঙ্কার প্রদর্শন করিল। লক্ষ্মণই প্রথমে সেই অলঙ্কার লইয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনি উহা চিনিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহার হস্ত হইতে অলঙ্কারটি লইয়া তৎক্ষণাৎ উহা সীতার বলিয়া চিনিলেন। ভারতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে এতদূর ভক্তি করা হইত যে, লক্ষ্মণ সীতার বাহু বা গলদেশের দিকে কখন চাহিয়া দেখেন নাই। সুতরাং বানরগণ প্রদর্শিত অলঙ্কারটি সীতার কণ্ঠভূষণ ছিল বলিয়া উহা চিনিতে

পারেন নাই। এই আখ্যানটিতে ভারতের প্রাচীন প্রথার আভাস পাওয়া যায়।

সেই সময়ে বানররাজ বালীর সহিত তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের বিবাদ হইতেছিল। বালী সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। রাম সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালীর নিকট হইতে সুগ্রীবের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিলেন। সুগ্রীবের এই উপকারের প্রত্যুপকার-স্বরূপে রামের সাহায্যে সম্মত হইলেন। সীতার অন্বেষণার্থ সুগ্রীব সর্ব্বত্র বানর-সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কোন সন্ধান করিতে পারিল না। অবশেষে হনুমান এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিয়া ভারতের উপকূল হইতে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও সীতার কোন সন্ধান পাইলেন না।

রাক্ষসরাজ রাবণ দেব মানব সকলকে, এমন কি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। সে জগতের সমুদয় সুন্দরী রমণীগণকে সংগ্রহ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার উপপত্নী করিয়াছিল। হনুমান্ ভাবিতে লাগিলেন, "সীতা কখন তাহাদের সহিত রাজপ্রাসাদে থাকিতে পারেন না—ওরূপ স্থানে বাসাপেক্ষা তিনি নিশ্চিত মৃত্যুকেও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিবেন।" এই ভাবিয়া হনুমান্ অন্যত্র সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সীতাকে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্টা দেখিতে পাইলেন—তাঁহার শরীর অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ—তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন প্রতিপদের শশিকলা আকাশে সবে উদয় হইতেছে। হনুমান্ তখন একটি ক্ষুদ্র কীশের রূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বৃক্ষের উপর উপবেশন করিলেন—তথা

হইতে দেখিতে লাগিলেন, রাবণপ্রেরিতা রাক্ষসীগণ আসিয়া সীতাকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সীতা রাবণের নামে পর্য্যন্ত কর্ণপাত করিলেন না।

চেড়ীগণ প্রস্থান করিলে হনুমান্ স্বস্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেবি, রামচন্দ্র আপনার অন্বেষণার্থ আমায় প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি সীতার প্রত্যয় উৎপাদনার্থ চিহ্নস্বরূপ রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দেখাইলেন। তিনি সীতাকে আরও জানাইলেন যে, সীতা কোথায় আছেন জানিতে পারিলেই রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় আসিয়া রাক্ষসরাজকে জয় করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন। এই সকল কথা সীতাকে নিবেদনান্তে হনুমান্ অবশেষে করজোড়ে বলিলেন, "দেবীর যদি ইচ্ছা হয় ত দাস আপনাকে স্কন্ধে লইয়া এক লম্ফে সাগর পার হইয়া রামচন্দ্রের নিকট পঁহুছিতে পারে।" কিন্তু সীতা পাতিব্রত্যধর্ম্মের সাকার বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, সুতরাং হনুমানের অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে গেলে পতি ব্যতীত অন্য পুরুষের অঙ্গস্পর্শ হইবে বলিয়া তিনি হনুমানের ওকথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি কেবল হনুমান্ যথার্থই সীতার উদ্দেশ পাইয়াছেন, রামচন্দ্রের এই বিশ্বাস উৎপাদনার্থ তাঁহাকে নিজ মস্তক হইতে চূড়ামণি প্রদান করিলেন। হনুমান্ ঐ চূড়ামণি লইয়া রামচন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন।

হনুমানের নিকট হইতে সীতার সংবাদ অবগত হইয়া রামচন্দ্র একদল বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের সর্ব্বশেষ প্রান্তে উপনীত হইলেন। তথায় রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মাণ

করিল। উহার নাম সেতুবন্ধ—ঐ সেতু ভারতের সহিত লঙ্কার সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছে। খুব ভাটার সময় এখনও ভারত হইতে লঙ্কায় বালুকাস্তুপের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারা যায়।

অবশ্য রাম ঈশ্বরাবতার ছিলেন, নতুবা তিনি এসকল দুষ্কর কর্ম্ম কিরূপে সম্পাদন করিবেন? হিন্দুদের মতে রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার ছিলেন। ভারতবাসিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের সপ্তমাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে।

বানরগণ সেতুবন্ধনের সময় এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড় উৎপাটন করিয়া আনিয়া সমুদ্রে স্থাপন করিয়া তাহার উপর রাশীকৃত শিলাখণ্ড ও মহীরুহসমূহ নিক্ষেপ করিয়া প্রকাণ্ড সেতু প্রস্তুত করিতেছিল। তাহারা দেখিল, একটা কাঠবিড়াল বালুকার উপর গড়াগড়ি দিতেছে, তারপর সেতুর উপর আসিয়া এদিক ওদিক করিতেছে ও নিজের গা ঝাড়া দিতেছে। এইরূপে সে নিজের সামর্থ্যানুসারে বালুকা প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের সেতু নির্ম্মাণকার্য্যে সাহায্য করিতেছিল। বানরগণ তাহার এই কার্য্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল। তাহারা এক একজন এক একবারেই এক একটা পাহাড়, এক একটা জঙ্গল ও রাশীকৃত বালুকা লইয়া আসিতেছিল, সুতরাং কাঠবিড়ালটির ঐরূপ বালুকার উপর গড়াগড়ি ও গা ঝাড়া দেওয়া দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। রামচন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিয়া বানরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাঠবিড়ালটির মঙ্গল হউক, সে তাহার প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার কার্য্যটুকু করিতেছে, অতএব সে তোমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে।" এই বলিয়া তিনি

আদর করিয়া কাঠবিড়ালটির পৃষ্ঠে হাত চাপড়াইলেন। এখনও কাঠবিড়ালের পৃষ্ঠে যে লম্বালম্বি দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে বলে, উহাই রামচন্দ্রের অঙ্গুলির দাগ।

সেতুনির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে সমুদয় বানরসৈন্য রাম ও তদীয় ভ্রাতা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। তারপর কয়েক মাস ধরিয়া রামচন্দ্রের সহিত রাবণের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অজস্র রক্তপাত হইতে লাগিল। অবশেষে রাক্ষসাধিপ রাবণ পরাজিত ও নিহত হইল। তখন সুবর্ণময় প্রাসাদাদিবিভূষিত রাবণের রাজধানী রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। ভারতের সুদূর পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে, তথাকার লোকদিগকে 'আমি লঙ্কায় গিয়াছিলাম' বলিলে তাহারা বলিত, "আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, তথাকার সমুদয় গৃহ সুবর্ণ-নির্ম্মিত।" যাহা হউক, লঙ্কার এই সমুদয় সুবর্ণময় নগরী রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যুদ্ধকালে রামের পক্ষে হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ রামচন্দ্র বিভীষণকে এই সমুদয় সুবর্ণময়ী নগরী প্রদান করিলেন এবং রাবণের স্থানে তাঁহাকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইলেন।

বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিলে রাম, সীতা ও অনুচরবর্গের সহিত লঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন। রাম যখন অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, তখন রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৈকেয়ীতনয় ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন, সুতরাং তিনি রামের বনগমনের বিষয় কিছুই জানিতেন না। অযোধ্যায় আসিয়া যখন সমুদয় শুনিলেন, তখন তাঁহার আনন্দ হওয়া দূরে থাকুক, শোকের

সীমা পরিসীমা রহিল না। বৃদ্ধ রাজা দশরথও এই সময়ে রামশোকে অধীর হইয়া দেহত্যাগ করেন। ভরত ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে অরণ্যে রামসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে পিতার স্বর্গগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন এবং রাজ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস না করিলে, পিতৃসত্য কোনরূপে রক্ষিত হইবে না।" চতুর্দ্দশবর্ষান্তে তিনি ফিরিয়া গিয়া রাজ্যগ্রহণ করিবেন। রামচন্দ্র তখন ভরতকে রাজ্যপালনের জন্য বারবার অনুরোধ করিতে থাকিলে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রামাজ্ঞা পালন করিতে হইল। কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পরম অনুরাগ ও ভক্তিবশতঃ স্বয়ং সিংহাসনে বসিতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। সিংহাসনের উপর রামচন্দ্রের কাষ্ঠ-পাদুকা স্থাপন করিয়া স্বয়ং রামচন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

সীতা উদ্ধারের পরই রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের সময় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং ভরত তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন জানিতে পারিয়া তিনি প্রজাবর্গের সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহকে সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকলের অনুরোধে রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রাচীনকালে রাজাকে সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রজাগণের

কল্যাণার্থ যে সকল ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, রাম যথাবিধানে তাহা গ্রহণ করিলেন। তখনকার রাজাগণ প্রজাবর্গের সেবকস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রজাবর্গের মতামতের অধীন হইয়া চলিতে হইত। আমরা এখনই দেখিব, এই প্রজারঞ্জনের জন্য রামচন্দ্রকে নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তম বস্তুকে কেমন মমতা হারাইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রাম অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, এবং কিছুকাল সীতার সহিত পরম সুখে যাপন করিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদিন রামচন্দ্র চরমুখে অবগত হইলেন যে, রাক্ষসাপহৃতা সমুদ্রপারনীতা সীতাকে তিনি গ্রহণ করাতে প্রজাবর্গ অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। রাবণবিজয়ের পরই রামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের সন্তোষবিধানার্থ তাঁহাকে স্বয়ং বিশুদ্ধস্বভাবা জানিয়াও সমবেত বানর ও রাক্ষসগণ সমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াছিলেন। যখন সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিলেন, তখন রামচন্দ্র, বুঝি সীতাকে হারাইলাম, ভাবিয়া শোকে মুহ্যমান হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, অগ্নিদেব স্বয়ং সেই অগ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইতেছেন—তাঁহার মস্তকে এক হিরণ্ময় সিংহাসন—তদুপরি সীতাদেবী উপবিষ্টা। ইহা দেখিয়া রামচন্দ্রের এবং সমবেত সকলেরই আনন্দের আর সীমা রহিল না। রাম পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যার প্রজাবর্গ এই অগ্নি-পরীক্ষার বিষয় অবগত ছিল, কিন্তু তাহারা উহা স্বয়ং না দেখাতে তাহাদের মন সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহারা আপনা আপনি বলাবলি করিত, সীতা রাবণগৃহে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, তিনি যে তথায় বাসকালে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধস্বভাবা ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি?

রাজা এইরূপ অবস্থায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতেছেন; হয় সর্ব্বসমক্ষে নিজ বিশুদ্ধ স্বভাবের পুনঃ পরীক্ষা দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য, নতুবা তাঁহাকে বিসর্জ্জন করাই রাজার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

প্রজাগণের সন্তোষবিধানার্থ সীতা অরণ্যে নির্ব্বাসিতা হইলেন। যথায় সীতা পরিত্যক্তা হইলেন, তাহার অতি নিকটেই আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। মহর্ষি তাঁহাকে একাকিনী রোরুদ্যমানা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন ও তাঁহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে নিজ আশ্রমে স্থান দান করিলেন। সীতা তখন আসন্নপ্রসবা ছিলেন—ঐ আশ্রমেই তিনি দুই যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। উপযুক্ত বয়স হইলে মহর্ষি তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করাইয়া যথাবিধানে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তিনি রামায়ণ নামক কাব্য রচনা করিয়া উহাতে সুর তাল সংযোজন করিলেন।

ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অতি পবিত্র বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে—উহাদিগকে লোকে ধর্ম্মসাধনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। লোকের ধারণা—প্রেমসঙ্গীতই হউক বা যাহাই হউক সঙ্গীতমাত্রেই যদি কেহ তন্ময় হইয়া যাইতে পারে, তবে তাহার অবশ্যই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস—ধ্যানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সঙ্গীতেও তাহাই হইয়া থাকে।

যাহা হউক, বাল্মীকি রামায়ণে সুরতাল সংযোগ করিয়া রামের পুত্রদ্বয়কে উহা গাহিতে শিখাইলেন।

ভারতে প্রাচীন রাজগণ মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধাদি বড় বড় যজ্ঞ

করিতেন—রামচন্দ্রও তদনুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন গৃহস্থ ব্যক্তির পত্নী ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার ছিল না—ধর্ম্মকার্য্যের সময় পত্নী অবশ্যই সঙ্গে থাকা চাই—সেইজন্য পত্নীর অপর একটি নাম সহধর্ম্মিণী—যাঁহার সহিত একত্রে মিলিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান করিতে হয়। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইত, কিন্তু পত্নী সঙ্গে থাকিয়া উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার কর্ত্তব্যটুকু অনুষ্ঠান না করিলে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানই বিধিমত অনুষ্ঠিত হইত না।

যাহা হউক, সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দেওয়াতে রাম কিরূপে বিধিপূর্ব্বক সস্ত্রীক অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, এখন এ প্রশ্ন উঠিল। প্রজাগণ তাঁহাকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু রামচন্দ্র জীবনে এই প্রথমবার প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন, "তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় সীতার নিকট পড়িয়া আছে।" সুতরাং শাস্ত্রবিধি রক্ষা করিবার জন্য সীতার প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁহার এক সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। এই যজ্ঞমহোৎসবে সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মভাব ও আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সঙ্গীতের আয়োজনও হইয়াছিল; কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকি নিজ শিষ্যদ্বয় সঙ্গে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। বলাবাহুল্য উহারা রামের অজ্ঞাত পুত্র লব ও কুশ। সভাস্থলে একটি রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল ও বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ গানের জন্য অনান্য সমুদয় আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সভাস্থলে রাম ও তদীয় অমাত্যবর্গ এবং অযোধ্যার সমুদয় প্রজা শ্রোতৃমণ্ডলিরূপে আসন গ্রহণ করিলেন।

বিপুল জনতা হইল। বাল্মীকির শিক্ষামত লব ও কুশ রামায়ণ গান করিতে লাগিল, তাহাদের মনোহর রূপলাবণ্য দর্শনে ও মধুর স্বর শ্রবণে সমগ্র সভ্যমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন। সীতার প্রসঙ্গ বার বার শ্রবণ করিয়া রাম উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, আর যখন সীতার বিসর্জ্জন প্রসঙ্গ আসিল, তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। মহর্ষি রামকে বলিলেন, "আপনি শোকার্ত্ত হইবেন না —আমি সীতাকে আপনার সমক্ষে আনয়ন করিতেছি।" এই বলিয়া বাল্মীকি সভাস্থলে সীতাকে আনয়ন করিলেন। সীতার দর্শনে অতিশয় বিহ্বল হইলেও প্রজাবর্গের সন্তোষবিধানার্থ রামকে সভাসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধতায় পুনঃ পরীক্ষাদানের প্রস্তাব করিতে হইল। দীনা সীতাদেবী বারংবার তাঁহার বিশুদ্ধতার উপর এরূপ নিষ্ঠুরভাবে সন্দেহ প্রকাশ হওয়াতে এতদূর কাতর হইলেন যে, তিনি আর উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিবার জন্য দেবগণের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—তখন হঠাৎ পৃথিবী দ্বিধা হইল—সীতা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"এই আমার পরীক্ষা।" এই বলিয়া তিনি পৃথিবীর বক্ষে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রজাবর্গ এই অদ্ভুত ও শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। রাম শোকে মুহ্যমান হইলেন।

সীতার অন্তর্দ্ধানের কিয়ৎকাল পরে দেবগণের নিকট হইতে জনৈক দূত আসিয়া রামকে বলিলেন, "পৃথিবীতে আপনার কার্য্য শেষ হইয়াছে। অতএব আপনি এক্ষণে স্বধাম বৈকুণ্ঠে চলুন।" এই বাক্যে রামের নিজস্বরূপস্মৃতি জাগরিত হইল। তিনি অযোধ্যার

সমীপবর্ত্তিনী সুরিদ্বরা সরযূর জলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া বৈকুণ্ঠে সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

ভারতে প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাব্য রামায়ণের আখ্যায়িকা অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। রাম ও সীতা ভারতবাসীর আদর্শ। ভারতের বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিকা মাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় রমণীগণের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা —পরমবিশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্ব্বংসহা সীতার মত হওয়া। এই সমুদয় চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর বিভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। (পাশ্চাত্য দেশ বলেন, "কর্ম্ম কর, কর্ম্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।" ভারত বলেন, "দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও।") মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাত্যদেশ এই সমস্যা পূরণ করিয়াছেন ; ভারত এদিকে মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে এই সমস্যা পূরণ করিয়াছেন। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্ত্তিমতী ভারতমাতা। সীতা বাস্তবিক ছিলেন কি না, সীতার উপাখ্যানের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, এ বিষয় লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না, কিন্তু আমরা জানি, সীতাচরিত্রে যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনও বর্ত্তমান। সীতাচরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে, সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ

করিয়াছে, যেমন উহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোন পৌরাণিক উপাখ্যানই তদ্রূপ করে নাই। সীতা নামটি ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্য—তাহারই পরিচায়কস্বরূপ। নারীগণের মধ্যে আমরা যে ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যখন স্ত্রীলোককে আশীর্ব্বাদ করেন, তিনি তাহাকে "সীতার মত হও" বলিয়া থাকেন, বালিকাকে আশীর্ব্বাদের সময়ও তাহাই বলা হয়। ভারতীয় রমণীগণ সকলেই আপনাদিগকে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি, সর্ব্বংসহা, সদা পতিপরায়ণা, নিত্য বিশুদ্ধস্বভাবা রামভার্য্যা সীতার সন্তান জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি এত দুঃখ সহিয়াছেন, কিন্তু রামের উদ্দেশে একটি কর্কশ বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া কখন নির্গত হয় নাই। এ সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করা তিনি নিজ কর্ত্তব্যরূপে মনে করিয়া লইয়াছেন, এবং স্থির শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। সীতার অরণ্যে নির্ব্বাসন ব্যাপার তাঁহার প্রতি কি ঘোর অবিচার ভাবিয়া দেখুন—কিন্তু তন্নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে বিন্দু মাত্র বিরক্তিভাবের উদয় হয় নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব। ভগবান্ বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, "আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের কোন প্রতিকার হইল না, উহাতে কেবল জগতে একটি পাপের বৃদ্ধিমাত্র হইবে।" ভারতের এই বিশেষ ভাবটি সীতার প্রকৃতিগত ছিল—তিনি অত্যাচারের প্রতিশোধের চিন্তা পর্য্যন্ত কখন করেন নাই।

কে জানে, এই দুইটি আদর্শের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ—পাশ্চাত্য-

মতানুযায়ী এই আপাতপ্রতীয়মান শক্তি ও তেজ, অথবা প্রাচ্যদেশীয় কষ্টসহিষ্ণুতা—তিতিক্ষা—ধৃতি ?

পাশ্চাত্যদেশীয়গণ বলেন,—আমরা দুঃখ কষ্টের প্রতিকার করিয়া উহার নিবারণ করিয়া দুঃখ কমাইবার চেষ্টা করিতেছি।" ভারতবাসী বলেন, "আমরা দুঃখ কষ্টকে সহিয়া সহিয়া উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ সহ্য করিতে করিতে আমাদের পক্ষে দুঃখ বলিয়া কিছু থাকিবে না, উহাই আমাদের পরম সুখ হইয়া দাঁড়াইবে।" যাহাই হউক, এই দুইটি আদর্শের কোনটিই হেয় নহে। কে জানে আখেরে কোন্ আদর্শের জয় হইবে ? কে জানে, কোন্ ভাব অবলম্বনে মানবজাতির যথার্থ কল্যাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে ? কে জানে, কোন্ ভাবাবলম্বনে পশুভাবকে নির্বীর্য্য করিয়া দিয়া পরিণামে তাহার উপর আধিপত্য লাভ হইবে ?—সহিষ্ণুতা বা ক্রিয়াশীলতা, অপ্রতিকার বা প্রতিকার ?

পরিণামে যাহাই হউক, ইতিমধ্যে যেন আমরা পরস্পরের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা না করি। আমরা উভয় জাতিই এক ব্রতে ব্রতী—সেই ব্রত সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তি। আপনারা আপনাদের ভাবে কার্য্য করিয়া যান, আমরা আমাদের পথে চলি। কোনও আদর্শকে, কোনও প্রণালীকে, কোনও পথকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমি পাশ্চাত্যগণকে একথা কখন বলি না, 'আপনারা আমাদের প্রণালী অবলম্বন করুন'। কখনই নহে। লক্ষ্য একই, কিন্তু উপায় কখন একরূপ হইতে পারে না। অতএব আমি আশা করি আপনারা ভারতের আদর্শ, ভারতের সাধন প্রণালীর কথা শুনিয়াই ভারতকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন—'আমরা জানি,

আমাদের উভয় জাতির লক্ষ্য একই, এবং আমাদের উভয়ের ঐ লক্ষ্যে পঁহুছিবার যে দ্বিবিধ উপায়, তাহাও আমাদের পরস্পরের ঠিক উপযোগী। আপনারা আপনাদের আদর্শ, আপনাদের প্রণালী অনুসরণ করুন—ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হউক।' আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে বলি—বিভিন্ন আদর্শ লইয়া বিবাদ করিও না, যতই বিভিন্ন প্রতীয়মান হউক, তোমাদের উভয়ের লক্ষ্য একই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলনচেষ্টাই আমার জীবনব্রত। উপসংহারে তাই বলি, জীবনের কুটিল বর্ত্ম দিয়া অগ্রসর হইবার সময় আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের লক্ষ্যসিদ্ধিই কামনা করি।

মহাভারত

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত প্যাসাডেনার
"সেক্সপিয়ার সভায়" প্রদত্ত বক্তৃতা

গতকল্য আমি রামায়ণ মহাকাব্য সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু শুনাইয়াছি। অদ্যকার সান্ধ্য সভায় অপর মহাকাব্যখানির সম্বন্ধে কিছু বলিব—উহার নাম মহাভারত। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে রাজা ভরত জন্মগ্রহণ করেন। রাজা ভরত হইতে যে বংশ প্রবর্ত্তিত হয়, মহাভারতে সেই বংশীয় রাজগণের উপাখ্যান আছে। উক্ত ভরত রাজা হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ হইয়াছে। এবং তাঁহার নাম হইতেই এই মহাকাব্যের নাম মহাভারত হইয়াছে। মহাভারত শব্দের অর্থ—মহান্ অর্থাৎ গৌরবসম্পন্ন ভারত অর্থাৎ ভারতবর্ষ; অথবা মহান ভরতবংশীয়গনের উপাখ্যান। কুরুদিগের প্রাচীন রাজ্যই এই মহাকাব্যের রঙ্গক্ষেত্র আর এই উপাখ্যানের ভিত্তি—কুরু পাঞ্চাল মহাসংগ্রাম। অতএব এই বিবাদের সীমাক্ষেত্র খুব বিস্তৃত নহে। এই মহাকাব্য ভারতে সর্ব্বসাধারণের বড়ই আদরের সামগ্রী। হোমরের কাব্য গ্রীকদের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, মহাভারতও ভারতবাসীর উপর তদনুরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যতই কাল যাইতে লাগিল ততই মূল মহাভারতের সহিত অনেক অবান্তর বিষয় সংযোজিত হইতে লাগিল—শেষে উহা প্রায় লক্ষ শ্লোকাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। কালে কালে মূল মহাভারতে নানাবিধ আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, পুরাণ, দার্শনিক

নিবন্ধ, ইতিহাস, নানাবিধ বিচার প্রভৃতি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে —পরিশেষে উহা এক প্রকাণ্ডকলেবর গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় অবান্তর প্রসঙ্গ থাকিলেও সমুদয় গ্রন্থের ভিতর মূল উপাখ্যানটি ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতের মূল উপাখ্যানটি এই—ভারত-সাম্রাজ্যের জন্য কৌরব ও পাণ্ডব নামক এক বংশীয় জ্ঞাতিগণের মধ্যে যুদ্ধ।

আর্য্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভারতে প্রবেশ করেন। ক্রমে আর্য্যগণের এই সকল বিভিন্ন শাখা ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে আর্য্যগণই ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসন কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময়েই এক বংশের দুই বিভিন্ন শাখার ভিতর অন্যতরকে পরাভূত করিয়া একের স্বয়ং প্রভুত্ব লাভ করিবার চেষ্টা হইতে এই যুদ্ধের উৎপত্তি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা গীতা পড়িয়াছেন, তাঁহাদেরই জানা আছে, উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভেই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যাধিকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা। ইহাই এই মহাভারতের যুদ্ধ।

কুরুবংশীয় মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র ছিলেন—জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র, কনিষ্ঠ পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুসারে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ এবং ক্ষয়রোগ বা অন্য কোন প্রকার স্থায়িব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি পৈতৃক ধনের অধিকারী হইতে পারে না, সে কেবল নিজ ভরণপোষণের ব্যয় মাত্র পাইতে পারে। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারিলেন না, পাণ্ডুই রাজা হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের এক শত এবং পাণ্ডুর পাঁচটি মাত্র পুত্র ছিল। অল্প বয়সে পাণ্ডুর দেহত্যাগ হইলে ধৃতরাষ্ট্রের উপরই রাজ্যভার পড়িল। তিনি পাণ্ডুর পুত্রগণকে নিজ পুত্রগণের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহাধনুর্দ্ধর বিপ্র দ্রোণাচার্য্যের উপর তাঁহাদের শিক্ষাভার অর্পিত হইল; দ্রোণাচার্য্যের নিকট তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন। রাজপুত্রগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরায়ণতা ও বহুবিধ গুণগ্রাম এবং তাঁহার ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের শৌর্য্যবীর্য্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অপরিসীম ভক্তি দর্শনে অন্ধরাজের পুত্রগণের হৃদয়ে বিষম ঈর্য্যার উদয় হইল এবং তাহাদের জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধনের কৌশলে পঞ্চ পাণ্ডব এক ধর্ম্মমহোৎসব দর্শনচ্ছলে বারণাবত নগরে প্রেরিত হইলেন। তথায় দুর্য্যোধনের উপদেশানুসারে তাঁহাদের বাসার্থ, শন, সর্জ্জরস, জতু, লাক্ষা, ঘৃত, তৈল ও অন্যান্য আগ্নেয় দ্রব্য দ্বারা এক প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল—সেই জতুগৃহে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় কিয়দ্দিবস বাসের পরে দুর্য্যোধনানুচর কর্ত্তৃক সেই গৃহে এক রাত্রে গোপনে অগ্নি প্রদত্ত হইল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা বিদুর, দুর্য্যোধন ও তদীয় অনুচরবর্গের এই দুরভিসন্ধির বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়া, পাণ্ডবগণকে এই চক্রান্তের বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন—সুতরাং তাঁহারা সকলের অজ্ঞাতসারে দহ্যমান জতুগৃহ হইতে পলায়নে কৃতকার্য্য হইলেন। কৌরবগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে জতুগৃহ দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে, তখন তাঁহারা অন্তরে পরম প্রমোদিত হইলেন—ভাবিতে

লাগিলেন, এতদিনে আমরা নিষ্কণ্টক হইলাম, আমাদের সকল বাধাবিঘ্ন এক্ষণে দূরীভূত হইল। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ রাজ্যভার গ্রহণ করিল। জতুগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব জননী কুন্তীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। গভীর অরণ্যানী মধ্যে তাঁহাদিগকে অনেক দুঃখকষ্ট, দৈবদুর্বিপাক সহ্য করিতে হইল, কিন্তু তাঁহারা শৌর্য্যবীর্য্য ও ধৃতিবলে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, নিকটবর্ত্তী পাঞ্চাল দেশের রাজকন্যার শীঘ্র স্বয়ম্বর হইবে এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন।

আমি বিগত রজনীতে এই স্বয়ম্বর প্রথার বিষয় একবার উল্লেখ করিয়াছি। কোন রাজকন্যার স্বয়ম্বরের সময়, চতুর্দ্দিক হইতে বিভিন্ন দেশীয় রাজপুত্রগণ স্বয়ম্বরসভায় আহূত হইতেন। এই সকল সমবেত রাজকুমারগণের মধ্য হইতে রাজকন্যাকে ইচ্ছামত বর মনোনীত করিতে হইত। নকীব রাজপরিচারকগণ মাল্যহস্তা রাজকুমারীর অগ্রে অগ্রে যাইয়া প্রত্যেক রাজকুমারের সিংহাসনের নিকট গিয়া তাঁহার নাম ধাম বংশমর্য্যাদা শৌর্য্যবীর্য্যের বিষয় উল্লেখ করিত—রাজকন্যা সকলকে দেখিয়া যাঁহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, তাঁহার গলদেশে ঐ বরমাল্য অর্পণ করিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার কন্যা দ্রৌপদীর রূপগুণের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ছিল—সেই দ্রৌপদীই স্বয়ম্বরা হইবেন, পাণ্ডবেরা শুনিলেন।

স্বয়ম্বরে প্রায়ই কোন না কোন পণ থাকিত। রাজকুমারী পাণিপ্রার্থীকে সাধারণতঃ কোন প্রকার শৌর্য্যবীর্য্যের পরিচয়, অস্ত্রশিক্ষার কৌশলাদি দেখাইতে হইত। দ্রুপদরাজা স্বয়ম্বরসভায় তদীয় কন্যার পাণিপীড়নার্থিগণের বলপরীক্ষার এইরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন :—খুব ঊর্দ্ধদেশে আকাশে একটি কৃত্রিম মৎস্য লক্ষ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নদেশে সতত ঘূর্ণ্যমান মধ্যচ্ছিদ্র একটি চক্র স্থাপিত ছিল, এবং আরও নিম্ন ভূমিতে একটি জলপাত্র। জলপাত্রে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চক্রচ্ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণদ্বারা মৎস্যের চক্ষু যিনি বিঁধিতে পারিবেন, তিনিই রাজকুমারীকে লাভ করিবেন। এই স্বয়ম্বর সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজা ও রাজকুমারগণ সমবেত হইয়াছিলেন—সকলেই রাজকুমারীর পাণিপীড়নার্থ সমুৎসুক—সকলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

আপনারা সকলেই ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিষয় অবগত আছেন —সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ—পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পৌরোহিত্য বা যাজনাদি তাঁহাদের কার্য্য ; ব্রাহ্মণের নীচেই ক্ষত্রিয়—রাজাগণ ও অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ এই ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ; তৃতীয়, বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসায়ী ; চতুর্থ, শূদ্র বা সেবক। অবশ্য এই রাজকুমারী ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্তা ছিলেন।

যখন রাজপুত্রগণ সকলেই লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন দ্রুপরাজপুত্র সভামধ্যে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয়বর্ণ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন—এক্ষণে অন্য ত্রিবর্ণের মধ্যে যে কেহও লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন ; ব্রাহ্মণই

হউন, বৈশ্যই হউন, এমন কি শূদ্রই হউন, যিনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই দ্রৌপদীকে লাভ করিবেন।”

ব্রাহ্মণগণমধ্যে পঞ্চপাণ্ডব সমাসীন ছিলেন—তন্মধ্যে অর্জ্জুনই পরম ধনুর্দ্ধর। দ্রুপদপুত্রের পূর্ব্বোক্ত আহ্বান শ্রবণে তিনি উঠিয়া লক্ষ্য বিঁধিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণজাতি সাধারণতঃ অতি শান্তপ্রকৃতি ও কিঞ্চিৎ নম্রস্বভাব। শাস্ত্রবিধানানুসারে তাঁহাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করা বা সাহসের কর্ম্ম করা নিষিদ্ধ। ধ্যান, ধারণা, স্বাধ্যায় ও আত্মসংযমে সদাসর্ব্বদা নিযুক্ত থাকাই তাঁহাদের শাস্ত্রসঙ্গত ধর্ম্ম। অতএব ইঁহারা কিরূপ শান্তপ্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয়, তাহা ভাবিয়া দেখুন। ব্রাহ্মণেরা যখন দেখিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন উঠিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আচরণে ক্ষত্রিয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সকলকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে তদীয় অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়, তিনি তাঁহাদের কথায় নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি অবলীলাক্রমে ধনুঃ তুলিয়া উহাতে জ্যা রোপণ করিলেন। পরে ধনুঃ আকর্ষণ করিয়া অনায়াসে চক্র-চ্ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাণক্ষেপণ করিয়া লক্ষ্য-মৎস্যের চক্ষুঃ বিদ্ধ করিলেন।

তখন সভাস্থলে তুমুল আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। রাজকুমারী দ্রৌপদী অর্জ্জুনের নিকট অগ্রসর হইয়া তদীয় গলদেশে মনোহর বরমাল্য অর্পণ করিলেন। কিন্তু এদিকে রাজগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। এই মহতী সভায় সমবেত রাজা ও রাজকুমারগণকে অতিক্রম করিয়া একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-

জাতিসম্ভূতা পরমা সুন্দরী রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে, এ চিন্তাও তাঁহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে দ্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবেন স্থির করিলেন। পাণ্ডবগণের সহিত রাজগণের তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পাণ্ডবেরা কোন মতে পরাভূত হইলেন না, অবশেষে জয়লাভ করিয়া দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়া গেলেন।

পঞ্চভ্রাতা এক্ষণে রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের বাসস্থানে জননী কুন্তীসমীপে প্রত্যাগত হইলেন। ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের উপ-জীবিকা—সুতরাং ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করাতে ইঁহাদিগকেও বাহিরে গিয়া খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। ভিক্ষালব্ধ বস্তু গৃহে আসিলে কুন্তী উহা তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন। পঞ্চভ্রাতা যখন দ্রৌপদীকে লইয়া মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কৌতুকবশে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ মা, আজ কেমন মনোহর ভিক্ষা আনিয়াছি।" কুন্তী না দেখিয়াই বলিলেন, "যাহা আনিয়াছ, পাঁচজনে মিলিয়া ভোগ কর।" এই কথা বলিবার পর যখন রাজকুমারীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! এ আমি কি কথা বলিলাম—এ যে এক কন্যা!" কিন্তু এখন আর কি হইবে? মাতৃ-বাক্যলঙ্ঘন ত আর হইতে পারে না—মাতৃ-আজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবে। তাঁহাদের জননী জীবনে কখন মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না, ঐ বাক্য অবশ্য সত্য হওয়া চাই। এইরূপে দ্রৌপদী পঞ্চভ্রাতার সাধারণ সহধর্ম্মিণী হইলেন।

আপনারা জানেন, প্রত্যেক সমাজেই সামাজিক রীতিনীতির ক্রমবিকাশের বিভিন্ন সোপান আছে। এই মহাকাব্যের ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু আশ্চর্য্য আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত-প্রণেতা, পঞ্চভ্রাতা মিলিয়া যে এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে কোনরূপ সামাজিক প্রথা বলিয়া নির্দ্দেশ না করিয়া উহার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা পাইয়াছেন। মাতৃ-আজ্ঞা—তাঁহাদের জননী এই অদ্ভুত পরিণয়ে সম্মতিদান করিয়াছেন ইত্যাদি নানা যুক্তি দিয়া মহাভারতকার এই ঘটনাটির উপর টীকা করিয়াছেন। কিন্তু আপনাদের জানা আছে, সকল সমাজে এমন এক অবস্থা ছিল যে, বহুপতিত্ব সমাজের অনুমোদিত ছিল—এক পরিবারের সকল ভ্রাতায় মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করিত। ইহাই সেই অতীত বহুপতিক যুগের একটা পরবর্ত্তী আভাস মাত্র।

যাহা হউক, এদিকে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান করিলে তাঁহার ভ্রাতার মনে নানাবিধ আন্দোলন হইতে লাগিল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "যে পঞ্চ ব্যক্তি আমার ভগিনীকে লইয়া গেল, ইহারা কে! আমার ভগিনী যাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিলেন, যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সেই বা কে! ইহাদের ত অশ্ব রথ বা অন্য কোনরূপ ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন দেখিতেছি না—ইহারা ত পদব্রজেই গেল দেখিলাম।" মনে মনে এই সকল বিতর্ক করিতে করিতে তিনি তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় জানিবার জন্য দূরে দূরে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। অবশেষে গোপনে রাত্রে তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহারা যে যথার্থ ক্ষত্রিয়, এ বিষয়ে তাঁহার

কোন সংশয় রহিল না। তখন দ্রুপদরাজা তাঁহাদের যথার্থ পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

অনেকে প্রথমে এক স্ত্রীর এইরূপ বহুবিবাহে ঘোরতর আপত্তি করিলেন বটে, কিন্তু ব্যাসের উপদেশে সকলে বুঝিলেন যে, এক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহ দোষাবহ হইতে পারে না। সুতরাং দ্রুপদরাজকেও এইরূপ বিবাহে সম্মত হইতে হইল—রাজকুমারী পঞ্চপাণ্ডবের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হইলেন।

পরিণয়ের পর পাণ্ডবগণ পরমানন্দচিত্তে দ্রুপদগৃহে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহাদের বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা জীবিত আছেন দগ্ধ হন নাই, ক্রমে এ সংবাদ কৌরবগণের নিকট পঁহুছিল। দুর্য্যোধন ও তদীয় অনুচরবর্গ পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবার জন্য নূতন নূতন ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি বর্ষীয়ান্ মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের পরামর্শে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে লইয়া গেলেন। প্রজাবর্গ পাণ্ডবগণকে বহুদিনের পর দর্শন করিয়া পরমানন্দে মহোৎসব করিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। তখন পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থ নামক মনোহর নগরী নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহারা আপনাদের রাজ্য ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন, চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণকে বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগকে আপনাদের করদ করিলেন। অতঃপর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আপনাকে ভারতের তদানীন্তন সমস্ত রাজগণের সম্রাটরূপে ঘোষণা করিবার জন্য রাজসূয়

যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন—এই যজ্ঞে পরাজিত রাজগণকে কর লইয়া আসিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় ও প্রত্যেককে যজ্ঞোৎসবের এক একটি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজ হস্তে তাহা সম্পাদন করিয়া যজ্ঞকার্য্যের সাহায্য করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধুও ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের নিকট আসিয়া রাজসূয়যজ্ঞনির্ব্বাহ বিষয়ে নিজ সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু রাজসূয়যজ্ঞ সম্পাদনের একটি বিষম বিঘ্ন ছিল। জরাসন্ধ নামক জনৈক রাজা একশত রাজাকে বলি দিয়া নরমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ষড়শীতি জন রাজাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শানুসারে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন জরাসন্ধের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। জরাসন্ধও সম্মত হইলেন। চতুর্দ্দশ দিবস ক্রমাগত দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর ভীম জরাসন্ধকে পরাভূত করিলেন। তখন বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

ইহার পর যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতা সৈন্যসামন্ত লইয়া প্রত্যেকে এক এক দিকে দিগ্বিজয়ার্থ নির্গত হইলেন ও সমস্ত রাজবর্গকে যুধিষ্ঠিরের বশে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জয়লব্ধ অগাধ ধন সম্পত্তি ঐ বিরাট যজ্ঞের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্পণ করিলেন।

এইরূপে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং জরাসন্ধের কারাগার হইতে মুক্ত রাজগণ রাজসূয় যজ্ঞে আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার এবং তাঁহার যথোচিত সম্মাননা করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্রগণও এই যজ্ঞে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া-

ছিলেন। যজ্ঞাবসানে যুধিষ্ঠির সম্রাটের মুকুটে ভূষিত ও রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। এইখান হইতেই কৌরব ও পাণ্ডবগণের ভাবী বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। পাণ্ডবগণের রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি দুর্য্যোধনের অসহ্য জ্ঞান হইল, সুতরাং তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রবল ঈর্ষ্যার ভাব লইয়া রাজসূয় যজ্ঞ হইতে ফিরিলেন। তিনি এইরূপে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কিরূপে ছলে কৌশলে পাণ্ডবগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে নানাবিধ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, কারণ, তিনি জানিতেন, বলপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পরাভূত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। রাজা যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি ছিল—অতি অশুভ ক্ষণে তিনি চতুর অক্ষবেদী ও দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণাদাতা শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতে আহূত হইলেন। প্রাচীন ভারতে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, ক্ষত্রিয়জাতীয় কোন ব্যক্তি যুদ্ধার্থ আহূত হইলে সর্ব্ববিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিজ মানরক্ষার্থ তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে; এইরূপ আবার দ্যূতক্রীড়ার্থ আহূত হইয়া ক্রীড়া করিলেই মানরক্ষা হইবে, আর ক্রীড়ায় অসম্মত হইলে তাহা অতি অযশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে। মহাভারত বলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে সেই রাজর্ষিকেও দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হইতে হইয়াছিল। শকুনি ও তাহার অনুচরবর্গ কৃত্রিম অক্ষ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাতেই যুধিষ্ঠির যতবার পণ রাখিতে লাগিলেন, ততবারই হারিতে লাগিলেন—বার বার এইরূপ পরাজিত হওয়াতে তিনি অন্তরে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া জয়াশায় যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই একে একে তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সমুদয় পণ রাখিতে লাগিলেন এবং একে

একে সমুদয়ই হারাইলেন—তাঁহার সমুদয় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বস্বই তিনি এইরূপে হারাইলেন। অবশেষে যখন তাঁহার সমুদয় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য কৌরবগণকর্ত্তৃক বিজিত হইল অথচ তাঁহাকে আবার বার বার ক্রীড়ার্থ আহ্বান করা হইতে লাগিল, তিনি দেখিলেন, তাঁহার নিজ ভ্রাতৃগণ, আপনি স্বয়ং এবং অনিন্দিত দ্রৌপদী ব্যতীত পণ রাখিবার তাঁহার আর কিছুই নাই। এইগুলির সমুদয়ই তিনি একে একে পণ রাখিলেন এবং একে একে সমুদয়ই হারাইলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ সম্পূর্ণরূপে কৌরবগণের বশীভূত হইলেন—তাহারা তাঁহাদিগকে কোনরূপে অবমাননা করিতে আর বাকি রাখিল না—বিশেষতঃ তাহারা দ্রৌপদীকে যেরূপ অবমাননা করিল, মানুষের প্রতি মানুষ কখন তদ্রূপ ব্যবহার করিতে পারে না। অবশেষে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কৃপায় তাঁহারা কৌরবগণের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন—রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহা-দিগকে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ্যশাসনে অনুমতি করিলেন। দুর্য্যোধন দেখিল বড় বিপদ—তাহার কৌশল বুঝি সব ব্যর্থ হয়; সুতরাং সে পিতাকে আর এক বার মাত্র ক্রীড়া করিতে অনুমতি দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিল—অবশেষে ধৃতরাষ্ট্র সম্মত হইলেন। এবার পণ রহিল, যে পক্ষ হারিবে, তাহাকে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু যদি এই অজ্ঞাতবাসমধ্যে জয়ী পক্ষ তাহাদের বাসস্থানের সন্ধান পায়, তবে পুনর্ব্বার ঐরূপ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে। কিন্তু যদি অজ্ঞাতবাসের সম্পূর্ণ কাল বিজিত পক্ষ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যাপন করিতে পারে, তবে আবার রাজ্য পাইবে।

এই শেষ খেলাতেও যুধিষ্ঠিরের হার হইল; তখন পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত নির্ব্বাসিত গৃহশূন্য ব্যক্তিগণের ন্যায় বনে গমন করিলেন। তাঁহারা অরণ্যে ও পর্ব্বতে কোনরূপে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করিলেন। এই সময়ে তাঁহারা ধার্ম্মিক ও বীরপুরুষোচিত অনেক কঠিন কঠিন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন—মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণ করিয়া বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্মৃতি-উপদ্দীক স্থানসমূহ দর্শন করেন। মহাভারতের এই বনপর্ব্বটি বড়ই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ—ইহা নানাবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকায় পূর্ণ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ধর্ম্ম ও দর্শনাত্মক অনেক মনোহর অপূর্ব্ব উপাখ্যান আছে। মহর্ষিগণ পাণ্ডবভ্রাতৃগণকে এই নির্ব্বাসনের দিনে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহারা যাহাতে নির্ব্বাসনদুঃখ অক্লেশে সহিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে প্রাচীন ভারতের অনেক অপূর্ব্ব মনোহর উপাখ্যান শুনাইতেন। আমি তন্মধ্যে একটি উপাখ্যান আপনাদিগকে বলিব।

অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সাবিত্রী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী গুণবতী কন্যা ছিল। হিন্দুদের এক অতি পবিত্র স্তোত্রের নাম সাবিত্রী। উক্ত কন্যার এত গুণ ও রূপ ছিল যে, তাঁহারও উক্ত সাবিত্রী নামকরণ হইয়াছিল। সাবিত্রী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তদীয় পিতা তাঁহাকে নিজ স্বামী স্বয়ং মনোনিত করিতে বলিলেন। আপনারা দেখিতেছেন এই ভারতীয় প্রাচীন রাজকন্যা-গণের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল—অনেক সময়েই তাঁহারা তাঁহাদের পাণিপীড়নার্থী রাজকুমারগণের মধ্য হইতে স্বয়ং পতিনির্ব্বাচন করিতেন।

সাবিত্রী পিতৃবাক্যে সম্মত হইয়া সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া নিজ পিতৃরাজ্য হইতে অতি দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদীয় পিতা কয়েকজন রক্ষী ও বৃদ্ধ সভাসদ্‌কে তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সমভিব্যাহারে অনেক রাজসভায় যাইয়া অনেক রাজকুমারকে দেখিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোহরণে সমর্থ হইল না। অবশেষে তিনি অরণ্যমধ্যবর্ত্তী এক পবিত্র তপোবনে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এই সকল অরণ্যে পশুগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিত—তথায় কোন জীবকে হত্যা করিতে দেওয়া হইত না। এইরূপে তথায় পশুগণ আর মানুষকে ভয় করিত না—এমন কি, সরোবরস্থ মৎস্যকুল পর্য্যন্ত মানুষের হস্ত হইতে নির্ভয়ে খাদ্য লইয়া যাইত। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই সকল অরণ্যে কেহ কোন জীবহত্যা করে নাই। মুনিগণ ও বৃদ্ধগণ তথায় মৃগ ও বিহঙ্গমগণের মধ্যে আনন্দে বাস করিতেন। এমন কি, কোন গুরুতর অপরাধীও এই সকল স্থানে যাইলে, তাহার উপর অত্যাচার করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। লোকে গার্হস্থ্যজীবনে যখন আর সুখ না পাইত, তখন এই সকল অরণ্যে গমন করিত—তথায় মুনিগণের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে ও তত্ত্ব-চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত।

দ্যুমৎসেন নামক জনৈক রাজা পূর্ব্বোক্ত তপোবনে বাস করিতেন। তিনি জরাগ্রস্ত ও দৃষ্টিশক্তিহীন হইলে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাভূত এবং তাঁহার রাজ্য অধিকার করিল। এই বৃদ্ধ অসহায় অন্ধ রাজা তদীয় মহিষী ও তনয়ের সহিত এই তপোবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথায় অতি

কঠোর তপস্যাচরণ করিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম সত্যবান্।

সাবিত্রী অনেক রাজসভা দর্শন করিয়া অবশেষে এই পবিত্র আশ্রমে উপনীত হইলেন। প্রাচীনকালে এই তপোবনবাসী ঋষিতপস্বিগণের উপর সকলেই এত শ্রদ্ধাভক্তির ভাব পোষণ করিতেন যে, একজন সম্রাটও এই সমস্ত তপোবন বা আশ্রমসমূহের নিকট দিয়া যাইবার সময়, এই সকল ঋষিমুনিগণকে পূজা করিবার জন্য আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এখনও ভারতে এই ঋষিমুনিগণের প্রতি লোকের এতদূর শ্রদ্ধার ভাব আছে যে তথাকার একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটও অরণ্যবাসী, ফলমূলভোজী, চীরপরিধায়ী কোন ঋষির বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া বরং পরম গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিবেন। আমরা সকলেই ঋষির বংশধর। এইরূপেই ভারতে ধর্ম্মের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অতএব রাজগণ যে তপোবনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই তপোবনবাসী ঋষিগণকে পূজা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? যদি তাঁহারা অশ্বারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে আশ্রমের বাহিরে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। আর যদি তাঁহারা রথারোহণে আসিয়া থাকেন, তবে রথ ও বর্ম্মাদি সমুদয় বাহিরে রাখিয়া আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বিনীত শমগুণসম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় না যাইলে কোন যোদ্ধারই আশ্রমমধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল না।

সুতরাং সাবিত্রী রাজকন্যা হইলেও এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় রাজতপস্বী দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবানকে দর্শন করিলেন। সত্যবানকে দর্শন করিয়াই সাবিত্রী মনে মনে তাঁহাকে হৃদয় সমর্পণ করিলেন। সাবিত্রী কত রাজপ্রাসাদে, কত রাজসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থানে কোন রাজকুমার তাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতে পারে নাই—কিন্তু এখানে, রাজা দ্যুমৎসেনের অরণ্যবাসে তদীয় পুত্র সত্যবান্ তাঁহার হৃদয় অপহরণ করিল।

সাবিত্রী পিতৃগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাবিত্রী, বৎসে, তুমি ত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিলে—বল দেখি, তুমি কোথাও এমন কাহাকে দেখিলে কি, যাহার সহিত তুমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর? বল মা, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া হৃদয়ের কথা খুলিয়া বল।" তখন সাবিত্রী লজ্জানম্রবদনে মৃদুস্বরে বলিলেন "হাঁ পিতঃ দেখিয়াছি।" পিতা কহিলেন, "বৎসে, যে রাজকুমার তোমার চিত্ত অপহরণ করিয়াছে তাহার নাম কি?" তখন সাবিত্রী বলিলেন, "তাঁহাকে ঠিক রাজকুমার বলিতে পারা যায় না, কারণ, তাঁহার পিতা দ্যুমৎসেন রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিয়াছে। অতএব তিনি রাজকুমার হইলেও রাজ্যের অধিকারী নহেন—তিনি তপস্বিভাবে জীবন যাপন করিতেছেন—বনজাত ফলমূল সংগ্রহ করিয়া কুটীরবাসী বৃদ্ধ জনকজননীর সেবানিরত রহিয়াছেন।"

তৎকালে দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাকে সাবিত্রীর সত্যবানকে পতিরূপে নির্ব্বাচন করার

কথা বলিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার মতামত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ বলিলেন, "এই নির্ব্বাচন বড়ই অশুভ হইয়াছে।" এই কথাগুলি শুনিয়া রাজা তাঁহাকে এইরূপ বলিবার কারণ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন, "অদ্য হইতে দ্বাদশমাসান্তে সত্যবান্ নিজ কর্ম্মানুসারে দেহত্যাগ করিবে।" রাজা নারদের এই কথা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে কন্যাকে বলিলেন, "সাবিত্রী, শুনিলে ত, অদ্য হইতে দ্বাদশমাসান্তে সত্যবান্ দেহত্যাগ করিবে—অতএব তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে অল্প বয়সেই বিধবা হইবে—একবার এই কথা বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ! বৎসে, তুমি সত্যবানের বিষয় আর হৃদয়ে স্থান দিও না—এরূপ অল্পায়ু আসন্নমৃত্যু বরের সহিত তোমার কোন মতে বিবাহ হইতে পারে না।" সাবিত্রী কহিলেন, "পিতঃ, সত্যবান্ অল্পায়ুই হউক বা আসন্নমৃত্যুই হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার হৃদয় সত্যবানের প্রতিই অনুরাগী, আমি মনে মনে সেই সাধুশীল বীর সত্যবানকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি। অতত্রব আপনি আমাকে অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি দ্বিচারিণী হইব। কুমারীর পতিনির্ব্বাচনে একবার মাত্র অধিকার আছে। একবার সে যাহাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কাহাকেও তাহার মনেও কখন স্থান দেওয়া উচিত নহে।" রাজা যখন দেখিলেন, সাবিত্রী সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয়া, তখন তিনি এই বিবাহ অনুমোদন করিলেন। সাবিত্রী সত্যবানের সহিত যথাবিধানে বিবাহিত হইয়া পিতার রাজপ্রাসাদ হইতে তদীয় মনোনীত পতির সহিত

বাসার্থ ও শ্বশুরশ্বশ্রূর সেবার্থ তাঁহাদের অরণ্যমধ্যস্থ আশ্রমে গমন করিলেন।

নারদের মুখ হইতে শুনিয়া সাবিত্রী সত্যবানের ঠিক কোন্ দিন দেহত্যাগ হইবে তাহা অবগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উহা সত্যবানের নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন। সত্যবান্ প্রতিদিন গভীর অরণ্যে গিয়া কাষ্ঠ এবং ফুল সংগ্রহ করিয়া পুনরায় কুটীরে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। সাবিত্রী রন্ধনাদি সমুদয় গৃহকার্য্য এবং বৃদ্ধ শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের জীবন সুখে দুঃখে অতিবাহিত হইতে লাগিল—অবশেষে সত্যবানের দেহত্যাগের দিন অতি নিকটবর্ত্তী হইল। আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাবিত্রী এক কঠোর ব্রত গ্রহণ করিলেন—তিনি উপবাসপরায়ণা হইয়া ও রাত্রিজাগরণ করিয়া অনবরত দেবারাধনা করিতে লাগিলেন। এই তিন রাত্রি তিনি পতির আসন্নমৃত্যু চিন্তা করিয়া যে কি গভীর দুঃখে কাটাইয়াছিলেন, অপরের অজ্ঞাতসারে কত অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন, দেবতার নিকট পতির শুভকামনায় কাতরভাবে কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? অবশেষে সেই কাল দিবসের প্রভাত উপস্থিত হইল। সে দিন আর সাবিত্রীর পতিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতে সাহস হইল না। অতত্রব সত্যবানের অরণ্যে কাষ্ঠ ও ফলফুল সংগ্রহ করিতে যাইবার সময় তিনি সেদিন শ্বশুর ও শ্বশ্রূর নিকট হইতে পতির সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাদের অনুমতি লাভ করিয়া তিনি সত্যবানের সঙ্গে অরণ্যে চলিলেন। হঠাৎ

সত্যবান্ বিজড়িতস্বরে পত্নীকে বলিলেন, “প্রিয়ে সাবিত্রী, আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমার ইন্দ্রিয়সকল অবসন্ন বোধ হইতেছে, আমার সমগ্র দেহ যেন নিদ্রাভারাক্রান্ত হইতেছে—আমি কিছুকাল তোমার পার্শ্বে বিশ্রাম করিব।” সাবিত্রী ভয়বিজড়িত ও কম্পিতস্বরে উত্তর দিলেন, “প্রভো, আপনি আমার অঙ্কদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করুন।” তখন সত্যবান্ নিজ উত্তপ্ত মস্তক সাবিত্রীর অঙ্কদেশে স্থাপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার শ্বাস হইল—তিনি দেহত্যাগ করিলেন। সাবিত্রী গলদশ্রুলোচনে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যমদূতগণ সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু যথায় সাবিত্রী পতির মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারা তাঁহার নিকটেই আসিতে পারিল না। তাহারা দেখিল সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বে অগ্নির গণ্ডি রহিয়াছে—যমদূতগণের মধ্যে কেহই সেই অগ্নির গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারিল না, তাহারা সকলেই সাবিত্রীর নিকট হইতে পালাইয়া গিয়া যমরাজের নিকট উপস্থিত হইল এবং সত্যবানের আত্মাকে আনিতে না পারিবার কারণ সমুদয় নিবেদন করিল।

তখন মৃত্যুদেবতা, মৃত ব্যক্তিগণের বিচারক যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকের বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রথম মানুষ যিনি মরেন, তিনিই মৃত্যুদেবতা অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী মৃত ব্যক্তিগণের অধিপতি হইয়াছেন। কোন ব্যক্তি মরিবার পর তাহাকে পুরস্কার দিতে হইবে অথবা সে শাস্তি পাইবে, তিনিই তাহা বিচার করেন। সেই যমরাজ এক্ষণে স্বয়ং আসিলেন।

অবশ্য যমরাজ যখন দেবতা, তখন সাবিত্রীর চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই অগ্নির গণ্ডির ভিতর তাঁহার অনায়াসে গমনাগমনের অধিকার ছিল। তিনি সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মা, তুমি এই শবদেহ পরিত্যাগ কর। কারণ, জানিও মর্ত্ত্য ব্যক্তিমাত্রকেই দেহত্যাগ করিতে হয়—ইহাই বিধির বিধান। মর্ত্ত্যগণের মধ্যে আমিই প্রথম মরিয়াছি—তার পর হইতে সকলকেই মরিতে হয়। মৃত্যুই মানবের নিয়তি।" যমরাজ এই কথা বলিলে সাবিত্রী সত্যবানের শবদেহ ত্যাগ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেলেন, তখন যম সত্যবানের দেহ হইতে তাঁহার জীবাত্মাকে বাহির করিয়া লইলেন। যম এইরূপে সেই যুবকের জীবাত্মাকে লইয়া স্বীয় পুরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তিনি শুনিলেন, তাঁহার পশ্চাতে শুষ্ক পত্রের উপর কাহার পদশব্দ হইতেছে। শুনিয়া তিনি ফিরিয়া দেখেন—সাবিত্রী। তখন তিনি সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সাবিত্রী, মা, বৃথা কেন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ? সকল মর্ত্ত্যজনেরই অদৃষ্টে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।" সাবিত্রী বলিলেন, "পিতঃ, আমি আপনার অনুসরণ করিতেছি না। কিন্তু আপনি যেমন বলিলেন, মর্ত্ত্যগণের পক্ষে মৃত্যুই বিধির বিধান, তদ্রূপ বিধির বিধানেই নারীও তাহার প্রিয় পতির অনুসরণ করিয়া থাকে—আর বিধির সনাতন বিধানেই পতিব্রতা ভার্য্যাকে কখন তাহার প্রিয় পতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না।" তখন যমরাজ বলিলেন, "বৎসে, তোমার ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব তুমি তোমার পতির পুনর্জ্জীবন ব্যতীত আমার নিকট

হইতে যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।” তখন সাবিত্রী বলিলেন, হে প্রভু যমরাজ, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দেন যে, আমার শ্বশুর যেন পুনরায় তাঁহার চক্ষু লাভ করেন ও সুখী হইতে পারেন।” যম বলিলেন, “আমি ধর্ম্মজ্ঞ, অয়ি প্রিয় বৎস্তে, তোমার এই ধর্ম্মসঙ্গত বাসনা পূর্ণ হউক।” এই বলিয়া যমরাজ সত্যবানের জীবাত্মাকে লইয়া আবার নিজ গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি পূর্ব্ববৎ আবার পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া আবার সাবিত্রীকে দেখিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, “বৎসে সাবিত্রী, তুমি এখনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ?” সাবিত্রী উত্তর দিলেন, “হাঁ পিতঃ, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি বটে। আমি যে না আসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কে যেন আমায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি ফিরিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমার মনপ্রাণ যে আমার স্বামীর নিকট পড়িয়া আছে, সুতরাং যেখানে আমার স্বামীকে লইয়া যাইতেছেন, তথায় আমার দেহও যাইতেছে। আমার আত্মা ত পূর্ব্বেই গিয়াছে—কারণ, আমার আত্মা আমার স্বামীর আত্মাতেই অবস্থিত। সুতরাং আপনি যখন আমার আত্মাকেই লইয়া যাইতেছেন, তখন আমার দেহ যাইবেই। উহা না গিয়া কি করিয়া থাকিবে?” যম কহিলেন, “সাবিত্রী, আমি তোমার বাক্যশ্রবণে পরম প্রীত হইলাম—আমার নিকট হইতে তোমার স্বামীর জীবন ব্যতীত আর এক বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী কহিলেন, “দেব, আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,

তবে আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আমার শ্বশুর যেন তাঁহার নষ্ট রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ফিরিয়া পান।" যম কহিলেন, "প্রিয় বৎসে, তোমার এই বরও প্রদান করিলাম। কিন্তু এক্ষণে তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, কারণ, জীবিত মর্ত্ত্য কখন যমরাজের সহিত যাইতে পারে না।" এই বলিয়া যম আবার চলিতে লাগিলেন। যম যদিও বারংবার সাবিত্রীকে ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু সেই নম্রস্বভাবা, পতিপরায়ণা সাবিত্রী তথাপি তাঁহার মৃত স্বামীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। যম আবার ফিরিয়া সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "হে সাবিত্রী, হে মহানুভবে, তুমি এরূপ তীব্র শোকে বিহ্বলা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় স্বামীর অনুসরণ করিও না।" সাবিত্রী কহিলেন, "আমার মনের উপর আমার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, আপনি আমার প্রিয়তম স্বামীকে যথায় লইয়া যাইবেন, আমি তথায়ই তাঁহার অনুসরণ করিব।" যম বলিলেন, "আচ্ছা সাবিত্রী, মনে কর তোমার স্বামী ইহলোকে অনেক পাপাচরণ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাকে নরকে যাইতে হইবে। তাহা হইলে কি সাবিত্রী তাহার প্রিয়তম পতির সহিত যাইতে প্রস্তুত?" পতির প্রতি পরম অনুরাগিণী সাবিত্রী কহিলেন, আমার পতি যেখানে যাইবেন, জীবনই হউক, মৃত্যুই হউক, স্বর্গই হউক, নরকই হউক, আমি পরমানন্দের সহিত তথায় যাইব।" যম কহিলেন, "বৎসে তোমার বচনাবলী পরম মনোহর ও ধর্ম্মসঙ্গত, আমি তোমার উপর পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আরও একটি বর প্রার্থনা কর, কিন্তু জানিও, মৃত ব্যক্তি কখন আবার জীবিত হয় না।" সাবিত্রী কহিলেন, যদি আমার প্রতি

এতদূর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমায় এই বর দান করুন, যেন আমার শ্বশুরের রাজবংশ লোপ না হয়, যেন সত্যবানের পুত্রগণ ঐ রাজ্য লাভ করে। তখন যমরাজ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, "বৎসে, তোমার মনস্কামনা সফল হউক, এই তোমার পতির জীবাত্মাকে পরিত্যাগ করিলাম,—তোমার পতি আবার জীবিত হইবে। সত্যবানের ঔরসে তোমার অনেক পুত্র জন্মিবে, কালে তাহারা রাজপদ লাভ করিবে। এক্ষণে গৃহে ফিরিয়া যাও। প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিল। পূর্ব্বে কোন রমণী পতিকে এরূপ ভাবে ভালবাসে নাই—আর আমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু-দেবতা—অকপট, অব্যভিচারী প্রেমের শক্তির নিকট—সেই আমিও পরাজিত হইলাম।"

সাবিত্রীর উপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল। ভারতে প্রত্যেক বালিকাকে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে—মৃত্যুও যাঁহার প্রেমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল, যিনি ঐকান্তিক প্রেমবলে যমরাজের নিকট হইতেও নিজ স্বামীর আত্মাকে ফিরাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

মহাভারত এই সাবিত্রীর উপাখ্যানের মত শত শত মনোহর উপাখ্যানে পূর্ণ। আমি আপনাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছি, জগতের মধ্যে মহাভারত একখানি বিপুলকলেবর গ্রন্থ। উহা অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত এবং প্রায় লক্ষ শ্লোকাত্মক।

যাহা হউক, এক্ষণে মূল উপাখ্যানের সূত্র আবার ধরা যাউক। পাণ্ডবগণ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন—এই অবস্থায় আমরা পাণ্ডবদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছি। তথায়ও

তাঁহারা দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণা-প্রসূত নানাবিধ অত্যাচার হইতে একেবারে নির্মুক্ত হন নাই, কিন্তু দুর্য্যোধন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধনে কখনই কৃতকার্য্য হয় নাই।

অরণ্যে বাসকালে পাণ্ডবগণের একদিনের ঘটনা আমি আপনাদের নিকট বলিব। একদিন তাঁহারা বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুলকে জল অন্বেষণ করিয়া আনিবার অনুমতি করিলেন। তিনি দ্রুতপদে গমন করিয়া অনেক অন্বেষণ করিয়া একস্থানে অতি নির্ম্মলসলিল এক সরোবর দর্শন করিলেন। তিনি যেমন জলপানার্থ সরোবরে অবতরণ করিবেন, শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "বৎস, জলপান করিও না। অগ্রে মৎকৃত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান কর, পরে এই জল যথেচ্ছা পান করিও।" কিন্তু নকুল অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত থাকাতে উক্ত বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া ইচ্ছামত জলপান করিলেন, জলপান করিবামাত্র তিনি দেহত্যাগ করিলেন। নকুলকে অনেকক্ষণ ফিরিতে না দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে নকুলের অন্বেষণার্থ ও জলানয়-নার্থ প্রেরণ করিলেন। সহদেবও ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে উক্ত সরোবরসমীপে যাইয়া ভ্রাতা নকুলকে মৃত অবস্থায় নিশ্চেষ্টভাবে পতিত দেখিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুদর্শনে অতিশয় শোকার্ত্ত সহদেব অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত থাকায় জলাভিমুখে যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি তিনিও নকুলের মত শুনিলেন, "বৎস, অগ্রে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান কর, পশ্চাৎ জলপান করিও।" তিনিও ঐ বাক্য অমান্য করিয়া জলপান করিলেন ও জলপানান্তেই নকুলের ন্যায় মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পরে অর্জ্জুন ও ভীমও ঐরূপ

ভ্রাতৃগণের অন্বেষণে ও জলানয়নার্থে প্রেরিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও কেহ ফিরিলেন না। তাঁহাদেরও নকুল সহদেবের ন্যায় অবস্থা হইল। তাঁহারাও জলপান করিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং উঠিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণের পর পরিশেষে সেই মনোহর সরোবরের সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে মৃত অবস্থায় ভূতলে শয়ান দেখিলেন। এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণ শোকভারাক্রান্ত হইল—তিনি ভ্রাতৃগণের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি হঠাৎ শুনিলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে, "বৎস, অতিসাহস করিও না। আমি একজন যক্ষ—বকরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া এই সরোবরে বাস করি—এই সরোবর আমার অধিকৃত। আমাকর্ত্তৃকই তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ প্রেতাধিপপুরীতে নীত হইয়াছে। হে রাজন্, যদি তুমিও তোমার ভ্রাতৃগণের ন্যায় আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান না করিয়া জলপান কর তবে তোমাকেও ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পার্শ্বে পঞ্চম শবরূপে শয়ন করিতে হইবে। হে কুরুনন্দন, প্রথমে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিয়া স্বয়ং যথেচ্ছা জলপান কর ও যত ইচ্ছা অন্যত্র লইয়া যাও।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি যথাযথ আপনার প্রশ্নগুলির উত্তরদানে চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে যথাভিরুচি প্রশ্ন করুন।" তখন যক্ষ তাঁহাকে একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, যুধিষ্ঠিরও সমুদয় প্রশ্নগুলিরই সদুত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে দুইটি প্রশ্ন ও তাহাদের যুধিষ্ঠির-প্রদত্ত উত্তর আপনাদের নিকট বলিতেছি। যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কিমাশ্চর্য্যং" অর্থাৎ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার কি? যুধিষ্ঠির তদুত্তরে বলিলেন,—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম॥"

ভাবার্থ—প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা দেখিতেছি, আমাদের চারিদিকে প্রাণিগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা এখনও মরে নাই, তাহারা ভাবিতেছে যে তাহারা কখনও মরিবে না। জগতের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার—মৃত্যু অহরহঃ সম্মুখে থাকিলেও কেহ বিশ্বাস করে না যে, সে মরিবে।

যক্ষের আর একটি প্রশ্ন ছিল, "কঃ পন্থাঃ"—অর্থাৎ কোন্ পথ অনুসরণ করিলে মানবের যথার্থ শ্রেয়োলাভ হয়? যুধিষ্ঠির ঐ প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান করেন—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

ভাবার্থ—তর্কের দ্বারা কিছুই নিশ্চয় হইতে পারে না—কারণ, জগতে নানা মতমতান্তর রহিয়াছে। বেদও নানাবিধ—উহার একভাগে যাহা বলিতেছে, অপর ভাগ তাহারই প্রতিবাদ করিতেছে। এমন দুই জন মুনি বাহির করিতে পারা যায় না, যাঁহাদের পরস্পর মতভেদ নাই। ধর্ম্মের রহস্য যেন তমোময় গুহায় নিহিত রহিয়াছে। অতএব মহাপুরুষগণ যে পথে চলিয়াছেন সেই পথই অনুসরণীয়।

যক্ষ যুধিষ্ঠিরের সমুদয় উত্তর শ্রবণ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "হে রাজন্, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি বকরূপী ধর্ম্ম। আমি তোমার পরীক্ষার জন্যই এইরূপ করিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহই মরে নাই। আমার মায়াবলেই তাহারা মৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হে ভরতর্ষভ, তুমি যখন অর্থকামাপেক্ষা অনৃশংসতাকে শ্রেষ্ঠতর স্থির করিয়াছে, তখন তোমার সকল ভ্রাতৃবর্গই জীবিত হউক।" যক্ষ এই কথা বলিবা-মাত্র ভীমাদি পাণ্ডবচতুষ্টয় জীবিত হইয়া উঠিলেন।

এই উপাখ্যান হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রকৃতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। যক্ষের প্রশ্নসমুদয়ের তৎপ্রদত্ত উত্তর হইতে আমরা দেখিতে পাই, রাজা অপেক্ষা তত্ত্বচিন্তাপরায়ণ যোগীর ভাবই তাঁহার মধ্যে প্রবল ছিল।

এদিকে পাণ্ডবদিগের দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের কাল শেষ হইয়া অজ্ঞাতবাস করিবার ত্রয়োদশ বর্ষ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। এই কারণে যক্ষ তাঁহাদিগকে বিরাটের রাজ্যে গমন করিয়া তথায় যাহার যেরূপ অভিরুচি, তদ্রূপ ছদ্মবেশে থাকিবার উপদেশ দিলেন।

এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সমাপনান্তে তাঁহারা বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাসের এক বর্ষ যাপনার্থ বিরাটরাজ্যে গমন করিলেন ও তথায় বিরাট রাজার অধীনে সামান্য সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার দ্যূতজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভাসদ্ হইলেন। ভীম পাচককর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুন নপুংসকবেশে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার শিক্ষক হইয়া রাজার অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। নকুল রাজার

অশ্বশালায় অধ্যক্ষ হইলেন এবং সহদেব রাজার গোসমূহের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীবেশে রাজ্ঞীর অন্তঃপুরে তাঁহার পরিচারিকারূপে গৃহীত হইলেন। এইরূপে ছদ্মবেশে পাণ্ডবভ্রাতৃগণ একবৎসর নিরাপদে অজ্ঞাতবাসের কাল অতিবাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাদের অন্বেষণার্থে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। একবর্ষ শেষ হইবার ঠিক পরেই কৌরবগণ তাঁহাদের সন্ধান পাইল।

এইবার যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। দূত ধৃতরাষ্ট্রসমীপে যাইয়া যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা ধর্ম্ম ও ন্যায়তঃ অর্দ্ধরাজ্যের অধিকারী; অতএব যেন তাঁহাদিগকে এক্ষণে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করা হয়। কিন্তু দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অতিশয় দ্বেষ করিত—সুতরাং সে কোনমতেই পাণ্ডবগণের এই ন্যায়সঙ্গত প্রার্থনায় সম্মত হইল না। পাণ্ডবেরা রাজ্যের অতি অল্পাংশস্বরূপ একটি প্রদেশ, এমন কি পাঁচখানি গ্রাম পাইলেই সন্তুষ্ট হইবেন বলিলেন। কিন্তু উদ্ধতস্বভাব দুর্য্যোধন বলিল যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও পাণ্ডবগণকে প্রদান করিবে না। ধৃতরাষ্ট্র সন্ধি করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কৃষ্ণও কৌরবসভায় গিয়া এই আসন্ন যুদ্ধ ও জ্ঞাতি ক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুরাদি কৌরব রাজসভার বৃদ্ধগণ দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু সন্ধির চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইল। সুতরাং উভয় পক্ষেই যুদ্ধের উদ্যোগ চলিতে লাগিল এবং ভারতের সকল ক্ষত্রিয়গণই এই যুদ্ধে যোগদান করিলেন।

এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণের প্রাচীন প্রথা ও নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইয়াছিল। একদিকে যুধিষ্ঠির, অপর দিকে দুর্য্যোধন উভয়েই নিজ নিজ পক্ষে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ভারতের সকল রাজগণের নিকট দূত পাঠাইতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, এইরূপ যাঁহার অনুরোধ প্রথমে পৌঁছিবে, ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়কে তাঁহারই পক্ষাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে বিভিন্ন রাজা ও যোদ্ধৃবর্গ অনুরোধের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে পাণ্ডব বা কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। পিতা হয়ত এক পক্ষে, পুত্র হয়ত অপর পক্ষে যোগ দিলেন। এক ভ্রাতা হয়ত এক পক্ষে অপর ভ্রাতা হয়ত অপর পক্ষে যোগ দিলেন। তখনকার সমরনীতি বড়ই অদ্ভুত প্রকারের ছিল। সারাদিনের যুদ্ধের পর সন্ধ্যা সমাগত হইলে যখন যুদ্ধ শেষ হইত, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আর শত্রুভাব থাকিত না, এমন কি এক পক্ষ অপর পক্ষের শিবিরে পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। আবার প্রাতঃকাল হইলেই কিন্তু তাহারাই পরস্পর যুদ্ধ করিবে। মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুগণ নিজেদের এই চরিত্রগত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। আবার সেই প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, অশ্বারোহী পদাতিককে আঘাত করিতে পারিবে না, বিষাক্ত অস্ত্রের দ্বারা কেহ কখন যুদ্ধ করিতে পারিবে না, নিজের যে সুবিধাগুলি আছে, শত্রুরও ঠিক সেইগুলি না থাকিলে তাহাকে কখন পরাভূত করিতে পারিবে না, কোন প্রকার ছল প্রয়োগ করিতে পারিবে না। মোটকথা, কোন প্রকারে শত্রুর কোন ছিদ্র

থাকিলে তাহার অবৈধ সহায়তা লইয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারিবে না, ইত্যাদি। যদি কেহ এই সকল সমরনীতি উল্লঙ্ঘন করিতেন তবে তিনি ঘোর অযশের ভাগী হইতেন, তাঁহার সাধু সমাজে মুখ দেখাইবার যো থাকিত না। তখনকার ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে শিক্ষিত হইতেন। যখন মধ্য-এসিয়া হইতে ভারতের উপর বহিরাক্রমণের তরঙ্গ আসিল, তখন হিন্দুরা তাঁহাদের আক্রমণকারীদের প্রতি সেই শিক্ষামতেই ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বারবার পরাভূত করিয়াছিলেন এবং প্রতিবার পরাভবের পরই উপহারাদি দিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানের সহিত গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধিই এই ছিল যে, অপরের দেশ কখন বলপূর্ব্বক অধিকার করিবে না, আর কেহ পরাস্ত হইলে তাঁহার পদমর্য্যাদানুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুসলমান বিজেতৃগণ কিন্তু হিন্দুরাজগণের উপর অন্য প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা একবার তাঁহাদিগকে হাতে পাইলে বিনা বিচারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেন।

এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। মহাভারত বলিতেছেন, যে সময়ে এই যুদ্ধ ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, তখন কেবল যে সাধারণ ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহা নহে; তখন দৈবাস্ত্রের ব্যবহার ছিল—এই দৈবাস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইলে মন্ত্রশক্তি, চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজন হইত। এইরূপ দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া এক ব্যক্তিই দশলক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে ও তাহাদিগকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া দগ্ধ করিতে পারিতেন। এই মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করিয়া এক বাণ প্রয়োগ

করিলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র বাণ বৃষ্টি হইবে—এই মন্ত্রশক্তিবলে, দৈবশক্তিবলে চারিদিকে বজ্রপাত হইবে, যে কোন জিনিষ দগ্ধ করিতে পারা যাইবে—ইত্যাদি নানাবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত—এই উভয় মহাকাব্যের মধ্যে একটি বিশেষ বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়—এই সব অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কামানের ব্যবহারও দেখিতে পাই। কামান খুব প্রাচীন জিনিষ—চীনবাসী ও হিন্দুরা—উভয়ে উহার ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের নগরসমূহের প্রাচীরে লৌহনির্ম্মিত শূন্যগর্ভ নলনির্ম্মিত শত শত অদ্ভুত অস্ত্র থাকিত। লোকে বিশ্বাস করিত, চীনেরা ইন্দ্রজালবিদ্যাদ্বারা শয়তানকে এক শূন্যগর্ভ লৌহনালীর ভিতর প্রবেশ করাইত—আর একটী গর্ত্তে একটু অগ্নিসংযোগ করিলেই শয়তান ভয়ঙ্কর শব্দে উহা হইতে বাহির হইয়া অসংখ্য লোকের বিনাশ সাধন করিত।

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈবাস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া এক ব্যক্তির যেমন লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার কথা পড়া যায়, তদ্রূপ তাঁহাদের যুদ্ধের জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন, ব্যূহরচনা, বিভিন্ন প্রকার সৈন্যবিভাগ প্রভৃতির বিষয়ও পড়া যায়। চারি প্রকার যোদ্ধার কথা মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে—পদাতি, অশ্বারোহী, হস্তী ও রথ। ইহার মধ্যে আধুনিক যুদ্ধে শেষ দুইটির ব্যবহার নাই। কিন্তু সে সময়ে উহাদের বিশেষ প্রচলন ছিল। শত সহস্র হস্তী, তাহাদের আরোহীর সহিত লৌহবর্ম্মাদিতে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হইয়া সৈন্যশ্রেণীরূপে গঠিত হইত—এই হস্তি-সৈন্যকে শত্রুসৈন্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তার পর

অবশ্য রথের খুব প্রচলন ছিল। আপনারা সকলেই প্রাচীন রথের ছবি দেখিয়াছেন। সকল দেশেই প্রাচীন কালে এই রথের ব্যবহার ছিল।

কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষই, কৃষ্ণ যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ পক্ষে আসিয়া যুদ্ধে যোগ দেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তবে তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধকালে পাণ্ডবগণকে পরামর্শদানে অঙ্গীকৃত হইলেন, আর দুর্য্যোধনকে নিজ অজেয় নারায়ণী সেনা প্রদান করিলেন।

এইবার কুরুক্ষেত্রের সুবৃহৎ ভূভাগে অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাযুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ উভয় পক্ষেরই আত্মীয় স্বজনগণ এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র বীর নিহত হইলেন। এমন কি, উভয় পক্ষের মিলিত যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, যুদ্ধাবসানে তাহার অতি অল্পই অবশিষ্ট রহিল। দুর্য্যোধনের দেহত্যাগের পর যুদ্ধের অবসান হইল—পাণ্ডবেরা বিজয়শ্রীর অধিকারী হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী এবং অন্যান্য রমণীগণ পতিপুত্রাদির শোকে অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন—যাহা হউক, অবশেষে সকলে কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে মৃত বীরগণের যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইল।

এই যুদ্ধের প্রধানতম ঘটনা অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ—যাহা ভগবদ্গীতা নামক অপূর্ব্ব ও অমর কাব্যরূপে জগতে পরিচিত। ভারতে ইহাই সর্ব্বজন পরিচিত ও সর্ব্বজনপ্রিয় শাস্ত্র—আর ইহাতে যে উপদেশ আছে, তাহা সকল উপদেশের

শ্রেষ্ঠ উপদেশ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে কৃষ্ণার্জ্জুনের যে কথোপকথন হয়, তাহাই ভগবদ্ গীতা নামে পরিচিত। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ গ্রন্থ পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে আমি উহা পড়িতে পরামর্শ দিই। ঐ গ্রন্থ আপনাদের দেশের উপরও কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা যদি আপনারা জানিতেন, তবে এতদিন উহা না পড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমার্স ন যে উচ্চ তত্ত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল যদি জানিতে চান, তবে শুনুন—তাহা এই গীতা। তিনি একবার ইংলণ্ডে কার্লাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কার্লাইল তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দেন—কংকর্ডে * যে উদার দার্শনিক তত্ত্বের আন্দোলন আরম্ভ হয়, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিই তাহার মূল। আমেরিকায় উদার ভাবের যত প্রকার আন্দোলন দেখিতে পাওয়া যায়, কোন না কোনরূপে সেগুলি উক্ত কংকর্ড আন্দোলনের নিকট ঋণী।

গীতার মূলনায়ক কৃষ্ণ। আপনারা যেমন ন্যাজারেথনিবাসী যীশুকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উপাসনা করেন, হিন্দুরা তেমনি ঈশ্বরের অনেক অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জগতের প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের বিনাশার্থ সময়ে সময়ে সমাগত অনেক অবতারের বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভারতের প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এক এক অবতারের উপাসক। কৃষ্ণের উপাসক এক সম্প্রদায়ও আছে। অন্যান্য অবতারের

* Concord—যুক্তরাজ্যের একটি সহর। এইখানে এমার্সন তাঁহার জীবনের শেষ ৪৮ বৎসর অতিবাহিত করেন।

উপাসক অপেক্ষা বোধ হয় ভারতে কৃষ্ণোপাসকের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কৃষ্ণভক্তগণ বলেন, কৃষ্ণই অবতারগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারের কথা ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা সব সন্ন্যাসী ছিলেন—সুতরাং গৃহীদের সুখে দুঃখে তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল না—কি করিয়াই বা থাকিবে? কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখ—তিনি কি পুত্ররূপে, কি পিতারূপে, কি রাজারূপে সর্ব্বাবস্থায়ই আদর্শ চরিত্র দেখাইয়াছেন, আর তিনি যে অপূর্ব্ব উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র জীবনে নিজে তাহা আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"—গীতা, ৪, ১৮।

ভাবার্থ—যিনি প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও নৈষ্কর্ম্ম্যের মধুর শান্তি সম্ভোগ করেন, আবার যিনি মহা নিস্তব্ধতার মধ্যেও মহাকর্ম্মশীল, তিনিই জীবনের রহস্য যথার্থ বুঝিয়াছেন।

কৃষ্ণ ইহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন—ইহার উপায় অনাসক্তি। সমুদয় কর্ম্ম কর, কিন্তু কিছুর সহিত আপনাকে মিশাইয়া ফেলিও না। তুমি সর্ব্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মা। কর্ম্ম আমাদের দুঃখের কারণ নহে, আসক্তিই দুঃখের কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থের কথা ধরুন, ধনবান্ হওয়া খুব ভাল কথা। কৃষ্ণের উপদেশ এই—অর্থ উপার্জ্জন কর, টাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু উহার প্রতি আসক্ত হইও না। পতিপত্নী, পুত্রকন্যা, আত্মীয়স্বজন, মানযশ

সকলের সম্বন্ধেই এই কথা। আপনার উহাদিগকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিবেন যে উহাদের প্রতি যেন আসক্ত হইয়া না পড়েন। আসক্তি বা অনুরাগের পাত্র কেবল একজন—স্বয়ং প্রভু ভগবান্—আর কেহ নহে। আত্মীয়স্বজনগণের জন্য কার্য্য করুন, তাহাদিগকে ভালবাসুন, তাহাদের হিতানুষ্ঠান করুন, যদি প্রয়োজন হয়, তাহাদের জন্য শত শত জীবন উৎসর্গ করুন, কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি আসক্ত হইবেন না। শ্রীকৃষ্ণের নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে উক্ত উপদেশের উদাহরণস্বরূপ ছিল।

স্মরণ রাখিবেন যে, যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত বর্ণিত আছে, তাহা অনেক সহস্র বর্ষ প্রাচীন, আর তাঁহার জীবনের কতক অংশ ন্যাজারেথনিবাসী যীশুর সহিত প্রায় সদৃশ। কৃষ্ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংস নামে একজন অত্যাচারী রাজা ছিল। আর কংস দৈববাণী শ্রবণে অবগত হইয়াছিল যে শীঘ্রই তাহার নিধনকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহা শুনিয়া সে নিজ অনুচরবর্গকে সমুদয় পুরুষ-শিশুকে হত্যা করিবার আদেশ দিল। কৃষ্ণের পিতামাতাও কংস কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—সেই কারাগারেই কৃষ্ণের জন্ম হইল। কৃষ্ণের জন্মগ্রহণমাত্র সমুদয় কারাগার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—নবজাত শিশু বলিয়া উঠিল, "আমিই সমগ্র জীব জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, জগতের কল্যাণার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" আবার কৃষ্ণকে রূপকভাবে গোচারণশীল বলা হইয়াছে,—তাঁহার একটি নাম রাখালরাজ। ঋষিরা দূর হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ ভগবান্ নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহা জানিতে

পারিয়া তাঁহারা তাঁহার পূজার জন্য উপস্থিত হইলেন। বাইবেলে যীশুর বিবরণেও পড়া যায়, তদানীন্তন রাজা হেরড ঐরূপ কোন দৈববাণী শুনিয়া শিশুহত্যার আদেশ দিয়াছিলেন—তাঁহার পিতামাতার পথভ্রমণকালে বেথলিহেমে একটি অশ্বের জাবপাত্রে তাঁহার জন্ম হয়। যীশুকে রূপকভাবে shepherd বা মেষপালক বলা হয়। ভগবান্ যীশু শিশুরূপে জন্মিয়াছেন জানিতে পারিয়া প্রাচ্যদেশ হইতে কয়েকজন জ্ঞানী পুরুষ সেই শিশুকে দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের জীবনে এইরূপ কয়েকটি ঘটনার সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু উভয়ের জীবনলীলায় অন্যান্য অংশে ঐ সাদৃশ্য নাই।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ এই অত্যাচারী কংসকে পরাভূত করিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং সিংহাসনাধিরোহণের কথন কল্পনাও করেন নাই। তিনি কর্তব্য বলিয়াই ঐ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন—উহার ফলাফল লইয়া—উহাতে নিজের কি স্বার্থ-সিদ্ধি হইতে পারে, এই বিষয়ে তাঁহার চিন্তাও উদয় হয় নাই।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে মহারথী বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম—যিনি অষ্টাদশদিবসের মধ্যে দশদিন যুদ্ধ করিয়া তখনও মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া শরশয্যায় শয়ান ছিলেন—যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, বিবাহবিধি প্রভৃতি বিষয় প্রাচীন ঋষিগণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট সাঙ্খ্য ও যোগতত্ত্ব এবং ঋষি, দেব ও প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা ও কিম্বদন্তী বিবৃত করিলেন। মহাভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভীষ্মের এই উপদেশে পূর্ণ—উহা হিন্দুগণের

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ বিধান, নীতিতত্ত্ব প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজপদে অভিষেকক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ভয়ঙ্কর রক্তপাতে এবং আত্মীয়স্বজন ও কুলবৃদ্ধগণের নিধনে তাঁহার হৃদয় অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি ব্যাসের উপদেশানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

যুদ্ধাবসানে পঞ্চদশবর্ষ যাবৎ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠির ও তদীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সসম্মানে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিলেন। পরে সেই বৃদ্ধ ভূপতি যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যের সমুদয় ভারার্পণ করিয়া নিজ পতিব্রতা মহিষী ও পাণ্ডবগণের মাতা কুন্তী সমভিব্যাহারে শেষ জীবন তপোনুষ্ঠানকামনায় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর ষটত্রিংশৎ বর্ষ অতিবাহিত হইলে একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহাদের পরম সুহৃৎ, পরম আত্মীয়, তাঁহাদের আচার্য্য, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্জ্জুন অনতিবিলম্বে দ্বারকায় গমন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বশ্রুত শোকসমাচারেরই সমর্থন করিলেন। শুধু কৃষ্ণ কেন, যাদবগণের প্রায় কেহই জীবিত ছিলেন না। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতৃগণের শোকে মুহ্যমান হইয়া ভাবিলেন, আর কেন, আমাদেরও যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া তাঁহারা রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া মহাপ্রস্থানার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন। প্রাচীনকালে ভারতে

রাজগণও অন্যান্য সকলের ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হইতেন। মহাপ্রস্থান এক প্রকার সন্ন্যাসবিশেষ। জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ মমতা ত্যাগ হইলে মানব এইরূপ সন্ন্যাসের অধিকারী হইয়া থাকে। ইহাতে তাঁহাকে পানাহার বর্জ্জিত হইয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে হিমালয়ে চলিতে হয়। এইরূপ চলিতে চলিতে দেহত্যাগ হইয়া থাকে।

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে হিমালয়ে উচ্চতম চূড়াসমূহ পার হইয়া যাইতে হয়। হিমালয়ের পরপারে সুমেরু পর্ব্বত। সুমেরু পর্ব্বতের চূড়ায় স্বর্গলোক। তথায় দেবগণ বাস করেন। কেহ কখন এপর্য্যন্ত তথায় সশরীরে যাইতে পারেন নাই। দেবগণ যুধিষ্ঠিরকে এই স্বর্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।

সুতরাং পঞ্চপাণ্ডব ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদী, স্বর্গগমনে কৃতসংকল্প হইয়া বল্কল পরিধানান্তর গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটি কুক্কুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে উত্তরাভিমুখে চলিতে চলিতে তাঁহারা হিমালয়ে উপনীত হইলেন ও ক্লান্তপদে হিমালয়ের চূড়ার পর চূড়া লঙ্ঘন করিতে করিতে অবশেষে সম্মুখে সুবিশাল সুমেরু গিরি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধ ভাবে বরফ ভাঙ্গিয়া চলিতেছেন, এমন সময়ে দ্রৌপদী হঠাৎ অবসন্নদেহে পড়িয়া গেলেন, আর উঠিলেন না। সকলের অগ্রগামী যুধিষ্ঠিরকে ভীম বলিলেন, "রাজন্, দেখুন, দেখুন, রাজ্ঞী দ্রৌপদী ভূমিতলে পতিতা হইয়াছেন।" যুধিষ্ঠিরের চক্ষু

দিয়া শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না, কেবল বলিলেন, "আমরা কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি, এখন আর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার সময় নাই। চল, অগ্রসর হও।" কিয়ৎক্ষণ পরে ভীম আবার বলিয়া উঠিলেন, "দেখুন, দেখুন, আমাদের ভ্রাতা সহদেব পড়িল।" রাজার শোকাশ্রু ঝরিল, কিন্তু তিনি থামিলেন না। কেবল বলিলেন, "চল, চল, অগ্রসর হও।"

সহদেবের পতনের পর এই অতিরিক্ত শীত ও হিমানীতে নকুল, অর্জ্জুন ও ভীমও একে একে পড়িলেন, কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির এক্ষণে একাকী হইলেও অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পশ্চাতে একবার ফিরিয়া দেখিলেন, যে কুক্কুরটি তাঁহাদের সঙ্গ লইয়াছিল, সে এখনও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ঐ কুক্কুরের সহিত হিমানীস্তূপের মধ্য দিয়া অনেক পর্ব্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে অবশেষে সুমেরু পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তখন স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল, দেবগণ এই ধার্ম্মিক রাজার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইবার ইন্দ্র দেবরথে আরোহণ করিয়া তথায় অবতীর্ণ হইলেন ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে রাজন্, তুমি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, এ পর্য্যন্ত তুমি ব্যতীত সশরীরে স্বর্গারোহণের অধিকার আর কেহ পায় নাই।" কিন্তু যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে বলিলেন, "আমি আমার একান্ত অনুগত ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে না লইয়া স্বর্গে গমন করিতে প্রস্তুত নহি।" তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, "তাঁহারা পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছেন।"

এখন যুধিষ্ঠির তাঁহার পশ্চাতে ফিরিয়া তাঁহার অনুসরণকারী সেই কুক্কুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, এস, রথে আরোহণ কর।" ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া কহিলেন, "রাজন্, আপনি একি বলিতেছেন! কুক্কুর রথে আরোহণ করিবে! এই অশুচি কুক্কুরটাকে আপনি ত্যাগ করুন। কুক্কুর কখন স্বর্গে যায় না। আপনার মনের ভাব কি? আপনি কি উন্মত্ত হইয়াছেন? মনুষ্যগণের মধ্যে আপনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, আপনিই কেবল সশরীরে স্বর্গগমনের অধিকারী।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে ইন্দ্র, হে দেবরাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সমুদয় সত্য; কিন্তু এই কুক্কুরটি হিমানীস্তূপ লঙ্ঘনের সময় প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত বরাবর আমার সঙ্গে আসিয়াছে, একবারও আমার সঙ্গ ত্যাগ করে নাই। আমার ভ্রাতৃগণ একে একে দেহত্যাগ করিল, মহিষী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল—সকলেই একে একে আমায় ত্যাগ করিল, কেবল এই একমাত্র আমায় ত্যাগ করে নাই। আমি এখন উহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?" ইন্দ্র বলিলেন, "কুক্কুরসঙ্গী মানবের স্বর্গলোকে স্থান নাই। অতএব কুক্কুরটিকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাতে আপনার কোন অধর্ম্ম হইবে না।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "কুক্কুরটি আমার সঙ্গে যাইতে না পাইলে আমি স্বর্গে যাইতে চাহি না। যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ আমি শরণাগতকে কখন পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি জীবন থাকিতে স্বর্গসুখ সম্ভোগের জন্য অথবা দেবতার অনুরোধেও ধর্ম্মপথ কখন পরিত্যাগ করিব না।" তখন ইন্দ্র কহিলেন, "রাজন্, আপনার শরণাগত কুক্কুরটি স্বর্গে গমন করে, ইহাই যদি আপনার একান্ত

অভিপ্রেত হয়, তবে আপনি এক কর্ম্ম করুন। আপনি মর্ত্ত্যগণের মধ্যে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, আর ও অশুচি প্রাণিহত্যাকারী, জীবমাংসভোজী, হিংসাবৃত্তিপরায়ণ কুক্কুর, ও পাপী, আপনি পুণ্যাত্মা। আপনি পুণ্যবলে যে স্বর্গলোক অর্জ্জন করিয়াছেন, আপনি উহার সহিত তাহা বিনিময় করিতে পারেন।" রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, "আমি ইহাতে সম্মত আছি। কুক্কুর আমার সমুদয় পুণ্য লইয়া স্বর্গে গমন করুক।"

যুধিষ্ঠির এই বাক্য বলিবামাত্র যেন পট পরিবর্ত্তন হইল। যুধিষ্ঠির দেখিলেন, তথায় কুক্কুর নাই, তৎস্থলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম বর্ত্তমান। তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজন্, আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যম, আপনার ধর্ম্ম পরীক্ষার্থ কুক্কুররূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আপনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আপনি যখন একটা ক্ষুদ্র কুক্কুরকে আপনার পুণ্যার্জ্জিত স্বর্গ প্রদান করিয়া স্বয়ং তাহার জন্ম নরকে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন আপনার ন্যায় নিঃস্বার্থ ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে নাই। হে মহারাজ, আপনার জন্মে বসুধাতল ধন্য হইয়াছে। আপনি সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অতিশয় অনুকম্পাসম্পন্ন—এইমাত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইলাম। অতএব আপনি অক্ষয় সুখকর লোকসমূহ লাভ করুন। হে রাজন্, আপনি নিজধর্ম্মবলে ঐ সকল লোক উপার্জ্জন করিয়াছেন—আপনার প্রকৃষ্ট স্বর্গপদ লাভ হইবে।"

তখন যুধিষ্ঠির স্বর্গীয় বিমানারোহণে ইন্দ্র, ধর্ম্ম ও অন্যান্য দেবগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় প্রথমে তাঁহার নরক-দর্শনাদি কিছু পরীক্ষা আবার হইল, পরে স্বর্গস্থ মন্দাকিনীতে অবগাহন করিয়া তিনি দিব্যদেহ লাভ করিলেন। অবশেষে অমর

দেবদেহ প্রাপ্ত ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তখন সকল দুঃখের অবসান হইল—তাঁহারা সকলে আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন।

এইরূপে মহাভারত উচ্চভাবাত্মক কবিতায় 'ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়' বর্ণনা করিয়া এইখানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

উপসংহারে বলি, আপনাদের নিকট মহাভারতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দিলাম। কিন্তু মহাপ্রতিভা ও মনীষাসম্পন্ন মহর্ষি বেদব্যাস ইহাতে যে অসংখ্য মহাপুরুষগণের উন্নত ও মহিমময় চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও দিতে পারিলাম না। ধর্ম্মভীরু অথচ দুর্ব্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মনে একদিকে ধর্ম্ম ও ন্যায় অপরদিকে পুত্রবাৎসল্যে আন্তরিক দ্বন্দ্ব, পিতামহ ভীষ্মের উন্নত চরিত্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের উন্নত ধর্ম্মভাব, অপর চারি পাণ্ডবের উন্নত চরিত্র—যাহাতে একদিকে মহাশৌর্য্যবীর্য্য অপর দিকে সর্ব্বাবস্থায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অপূর্ব্ব আজ্ঞাবহতার সমাবেশ—মানবীয় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র, এবং তপস্বিনী রাজ্ঞী গান্ধারী, পাণ্ডবগণের স্নেহময়ী জননী কুন্তী, ও সদা পতিভক্তিপরায়ণা, সহিষ্ণুতার বিগ্রহস্বরূপিণী দ্রৌপদী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র (যাহা পুরুষগণের চরিত্রের তুলনায় কোন অংশে অনুজ্জ্বল নহে)—এই কাব্যের এই সকল এবং অন্যান্য শত শত চরিত্র এবং রামায়ণের চরিত্রসমূহ বিগত সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া সমগ্র হিন্দুজগতের যত্নসঞ্চিত জাতীয় সম্পত্তি, এবং তাঁহাদের চিন্তারাশি ও চারিত্র্য-নীতির ভিত্তিস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক এই রামায়ণ ও

মহাভারত

মহাভারত প্রাচীন আর্য্যগণের জীবনচরিত ও জ্ঞানরাজির সুবৃহৎ বিশ্বকোষস্বরূপ। উহাতে যে সভ্যতার আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, সমগ্র মানবজাতিকে তাহা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

জড়ভরতের উপাখ্যান

(কালিফোর্ণিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

প্রাচীনকালে ভরত নামে এক প্রবলপ্রতাপ সম্রাট ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন। বৈদেশিকগণ যাহাকে 'ইণ্ডিয়া' নামে অভিহিত করেন, তাহা তদ্দেশবাসিগণের নিকট ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। তখন শাস্ত্রের শাসনানুসারে বৃদ্ধ হইলে সকল আর্য্য-সন্তানকেই সংসার ছাড়িয়া নিজ পুত্রের উপর সংসারের সমুদয় ভার—ঐশ্বর্য্য ধন সম্পত্তি সব তাহাকে সমর্পণ করিয়া—বান-প্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হইত। তথায় তাঁহাকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ আত্মার তত্ত্বচিন্তায় কালক্ষেপণ করিতে হইত—এইরূপে তিনি সংসারের বন্ধন ছেদন করিতেন। রাজাই হউন, পুরোহিতই হউন, কৃষকই হউন, দাসই হউন, পুরুষই হউন বা স্ত্রীই হউন, কাঁহারও এই শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিবার সাধ্য ছিল না। কারণ, গৃহস্থের সমুদয় অনুষ্ঠান—পিতা মাতা, ভগ্নী ভ্রাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা সকলেরই অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য—সেই এক চরম অবস্থার সোপানস্বরূপমাত্র, যে অবস্থায় মানবের জড়বন্ধন একেবারে চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া যায়।

রাজা ভরত বৃদ্ধ হইলে পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া বনে গমন করিলেন। এক সময়ে যিনি লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন, যিনি সুবর্ণরজতখচিত মর্ম্মরপ্রাসাদে বাস করিতেন, যাঁহার

পানপাত্র নানাবিধ রত্নখচিত ছিল, তিন হিমারণ্যের এক স্রোতস্বিনীতীরে কুশ ও তৃণযোগে স্বহস্তে এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং তথায় বাস করিয়া স্বহস্তে বন্য ফল মূল সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। মানবাত্মায় যিনি অন্তর্যামিরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, সেই পরমাত্মার অহরহঃ স্মরণ মননই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইল। এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল। একদিন রাজর্ষি নদীতীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন, এমন সময় তথায় এক হরিণী জলপানার্থ সমাগত হইল। ঠিক সেই সময়েই কিছুদূরে একটি সিংহ প্রবল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হরিণী এত ভীতা হইল যে, সে পিপাসা শান্তি না করিয়াই নদী পার হইবার জন্য উচ্চ লম্ফ প্রদান করিল। হরিণী আসন্নপ্রসবা ছিল। এইরূপে হঠাৎ ভয় পাওয়ায় এবং লম্ফপ্রদানের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তৎক্ষণাৎ সে একটি শাবক প্রসব করিয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। হরিণশাবকটি প্রসূত হইয়াই জলে পড়িয়াছিল—নদীর প্রবল তরঙ্গে তাহাকে প্রবলবেগে একদিকে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় রাজার দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল। রাজা নিজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া হরিণ-শাবকটিকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন, পরে নিজ কুটীরে লইয়া গিয়া অগ্নিসেকাদি বিবিধ যত্ন ও শুশ্রূষাসহকারে তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। করুণহৃদয় রাজর্ষি অতঃপর হরিণশিশুটির লালন পালনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, প্রত্যহ তাহার জন্য সুকোমল তৃণ ও ফলমূলাদি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে

লাগিলেন। সংসারোপরত রাজর্ষির জনকসুলভ যত্নে হরিণশিশুটি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—পরিশেষে সে একটি সুন্দরকায় হরিণ হইয়া দাঁড়াইল। যে রাজা নিজ মনের তেজে পরিবার, রাজ্যসম্পদ্, অতুল বিভব ও ঐশ্বর্য্যের উপর চির-জীবনের মমতা কাটাইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে নদী হইতে তৎকর্তৃক রক্ষিত মৃগটির উপর আসক্ত হইয়া পড়িলেন। হরিণের উপর তাঁহার স্নেহ যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই তিনি ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করিতে অক্ষম হইতে লাগিলেন। বনে চরিতে গিয়া যদি হরিণটির ফিরিতে বিলম্ব হইত, তাহা হইলে রাজর্ষির মন তাহার জন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইত। তিনি ভাবিতেন,—"আহা, বুঝি আমার প্রিয় হরিণটিকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়া থাকিবে, অথবা হয়ত তাহার অন্য কোনরূপ বিপৎপাত হইয়াছে, নতুবা তাহার এত বিলম্ব হইতেছে কেন ?"

এইরূপে কয়েক বর্ষ কাটিয়া গেল। অবশেষে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে রাজর্ষির মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাঁহার মন মৃত্যুকালেও আত্মতত্ত্বধ্যানে নিযুক্ত না হইয়া হরিণটির চিন্তায়ই নিযুক্ত ছিল। নিজ প্রিয়তম মৃগটির কাতর নয়নের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার জীবাত্মা দেহ-ত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে হরিণভাবনার ফলে পরজন্মে তাঁহার হরিণ-জন্ম হইল। কিন্তু কোন কর্ম্মই একেবারে ব্যর্থ হয় না। সুতরাং রাজর্ষি ভরত গৃহস্থাশ্রমে রাজারূপে এবং বানপ্রস্থাশ্রমে ঋষিরূপে যে সকল মহৎ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও ফল ফলিল—যদিও তিনি বাক্শক্তিরহিত হইয়া

পশু-শরীর পরিগ্রহ করিলেন, কিন্তু তিনি জাতিস্মর হইলেন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সমুদয় কথাই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত রহিল। তিনি নিজ সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বসংস্কারবশে ঋষিগণের আশ্রমের নিকট চরিতে যাইতেন, যথায় প্রত্যহ যাগ-হোম ও উপনিষদালোচনা হইত।

মৃগরূপী ভরত যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পরজন্মে কোন ধনী ব্রাহ্মণের কনিষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ জন্মেও তিনি জাতিস্মর হইলেন—সুতরাং পূর্ব্ববৃত্তান্ত সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক থাকায়, তাঁহার বাল্যকাল হইতেই এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইল যে, তিনি আর সংসারের পাপপুণ্যে জড়িত হইবেন না। শিশুর ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তিনি বেশ বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইলেন, কিন্তু কাহারও সহিত একটিও বাক্যালাপ করিতেন না—পাছে সংসারজালে জড়িত হইয়া পড়েন এই ভয়ে তিনি জড় ও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মন সেই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মে সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকিত, প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয় করিবার জন্যই তিনি জীবনধারণ করিতেন। কালক্রমে পিতার মৃত্যু হইল, পুত্রগণ পিতার সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন,—তাঁহারা তাঁহাদের ঐ সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জড় ও অকর্ম্মণ্য জ্ঞান করিয়া তৎপ্রাপ্য সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া তাহা নিজেরাই গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ভ্রাতার প্রতি এইটুকু মাত্র অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে দেহধারণোপযোগী আহার মাত্র দিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃজায়াগণ সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি অতি কর্কশ ব্যবহার করিতেন,—তাঁহাকে

সর্ব্বদা গুরুতর শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, আর যদি তিনি তাঁহাদের সকল কার্য্য খুঁটাইয়া করিতে অক্ষম হইতেন, তবে তাঁহাকে ঘোরতর নির্যাতন করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি বা ভয় হইত না, তিনি একটি মাত্র বাঙ্-নিষ্পত্তিও করিতেন না। যখন অত্যাচারের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত হইত, তখন তিনি গৃহ হইতে নিস্তব্ধভাবে বাহির হইয়া গিয়া তাঁহাদের ক্রোধোপশম পর্য্যন্ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিতেন—তাঁহাদের রাগ পড়িয়া গেলে আবার শান্তভাবে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন।

একদিন জড়ভরতের ভ্রাতৃবধূগণ তাঁহাকে অতিরিক্ত তাড়না করিলে তিনি গৃহের বাহির হইয়া গিয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই দেশের রাজা শিবিকাযোগে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ একজন শিবিকাবাহক অসুস্থ হইয়া পড়িল,—তখন রাজানুচরবর্গ তাহার স্থানে শিবিকাবহন-কার্য্যের জন্য আর একজন লোক অন্বেষণ করিতে লাগিল ও অনুসন্ধান করিতে করিতে জড়ভরতকে বৃক্ষতলে অবস্থিত দেখিতে পাইল। তাঁহাকে সবল যুবা পুরুষ দেখিয়া তাহারা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "রাজার এক শিবিকাবাহকের পীড়া হইয়াছে,—তুমি তাহার পরিবর্ত্তে রাজার শিবিকাবহন করিতে প্রস্তুত কি না।" ভরত তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। রাজানুচরগণ দেখিল, এ ব্যক্তি বেশ হৃষ্টপুষ্ট,—ইহা দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া শিবিকাবহনে নিযুক্ত করিল। ভরতও নীরবে শিবিকাবহন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

রাজা দেখিলেন, শিবিকা বিষমভাবে চলিতেছে। শিবিকার বহির্দ্দেশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি নূতন বাহককে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মূর্খ,—কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর্, যদি তোর স্কন্ধে বেদনা বোধ হইয়া থাকে, তবে কিছু বিশ্রাম কর্।" তখন ভরত স্কন্ধ হইতে শিবিকা নামাইয়া জীবনের মধ্যে এই প্রথম মৌনভঙ্গ করিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হে রাজন্, আপনি মূর্খ কাহাকে বলিতেছেন? কাহাকে আপনি শিবিকা নামাইতে বলিতেছেন? কে ক্লান্ত হইয়াছে, বলিতেছেন? কাহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন? হে রাজন্, 'তুই' শব্দের দ্বারা যদি আপনি এই মাংসপিণ্ড দেহটাকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে দেখুন, আপনার দেহও যেমন পঞ্চভূতনির্ম্মিত, এই দেহও তদ্রূপ। আর দেহটা ত অচেতন, জড়,—উহার কি কোন প্রকার ক্লান্তি বা কষ্ট থাকিতে পারে? যদি মন আপনার লক্ষ্য হয়, তবে আপনার মন যেরূপ, আমারও ত তাহাই—উহা ত সর্ব্বব্যাপী। আর যদি 'তুই' শব্দে দেহমনেরও অতীত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত উহা সেই আত্মতত্ত্ব—আমার যথার্থ স্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে—তাহা আপনাতেও যেমন, আমাতেও তদ্রূপ বর্ত্তমান—জগতের মধ্যে উহাই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তত্ত্ব। রাজন্, আপনি কি বলিতে চাহেন,—আত্মা কখনও ক্লান্ত হইতে পারেন? আপনি কি বলিতে চাহেন,—আত্মা কখন আহত হইতে পারেন? হে রাজন্, আমার—এই দেহটার—অসহায় পথসঞ্চারী কীটগুলিকে পদদলিত করিবার ইচ্ছা ছিল না—সেই কারণে যাহাতে তাহারা পদদলিত না হয়, এইভাবে সাবধান

হইয়া চালাইতেই শিবিকা বিষম হইয়াছিল। কিন্তু আত্মা ত কখন ক্লান্তি অনুভব করে নাই—উহা কখন দুর্ব্বলতা বোধ করে নাই। কারণ, আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্।" এইরূপে তিনি আত্মার স্বরূপ, পরাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় অনেক উপদেশ দিলেন। রাজা পূর্ব্বে বিদ্যা ও জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিলেন—তাঁহার অভিমান চূর্ণ হইল। তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া, ভরতের চরণে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে মহাভাগ, আপনি যে একজন মহাপুরুষ, তাহা না জানিয়াই আপনাকে শিবিকাবহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম—তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।" ভরত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ও পূর্ব্ববৎ আপন ভাবে নীরবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। যখন ভরতের দেহপাত হইল, তিনি চিরদিনের জন্য জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন।

প্রহ্লাদ-চরিত

(কালিফোর্ণিয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

হিরণ্যকশিপু দৈত্যগণের রাজা ছিলেন। দেব ও দৈত্য—উভয়েই এক পিতা হইতে উৎপন্ন হইলেও সর্ব্বদাই পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ ও পরস্পরে যুদ্ধ করিতেন। সচরাচর দৈত্যগণের মানবগণ প্রদত্ত যজ্ঞভাগে অথবা জগতের শাসনে অধিকার ছিল না। কিন্তু কখন কখন তাঁহারা প্রবল হইয়া দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদের সিংহাসন অধিকার ও কিছুকালের জন্য জগত শাসন করিতেন। তখন দেবগণ যাইয়া সমগ্র জগতের সর্ব্বব্যাপী প্রভু বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিতেন, তিনিও তাঁহাদিগকে উক্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন। দৈত্যগণ তৎকর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া বিতাড়িত হইতেন, দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতেন। পূর্ব্বোক্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু এইরূপে তাঁহার জ্ঞাতি দেবগণকে জয় করিয়া স্বর্গের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ত্রিভুবনে—অর্থাৎ মানব ও অন্যান্য জীবজন্তুগণ দ্বারা অধ্যুষিত মর্ত্ত্যলোক, দেব ও দেবতুল্য ব্যক্তিগণ দ্বারা অধ্যুষিত স্বর্গলোক এবং দৈত্যগণ দ্বারা অধ্যুষিত পাতাললোক—শাসনে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু আপনাকেই সমগ্র জগতের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন—তিনি ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, তিনি ছাড়া আর ঈশ্বর নাই, আর চারিদিকে আদেশ প্রচার করিলেন

যে, কোন স্থানে কেহ যেন সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর উপাসনা না করে, এখন হইতে সমুদয় পূজা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য।

হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি অতি শৈশবাবস্থা হইতে স্বভাবতঃই ভগবান্ বিষ্ণুতে অনুরক্ত ছিলেন। অতি শৈশবাবস্থায়ই প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ দেখিয়া তদীয় পিতা হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, আমি সমগ্র জগৎ হইতে বিষ্ণুর উপাসনা যাহাতে উঠিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমার নিজগৃহেই যদি ইহা প্রবেশ করে, তবেই ত সর্ব্বনাশ—অতএব প্রথম হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পুত্র প্রহ্লাদকে ষণ্ড ও অমর্ক নামক দুইজন কঠোর ছাত্র-শাসনদক্ষ আচার্য্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, প্রহ্লাদ যেন বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত কখন শুনিতে না পায়। আচার্য্যদ্বয় সেই রাজপুত্রকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার সমবয়স্ক অন্যান্য বালকগণের সহিত রাখিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিশু প্রহ্লাদ তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষাগ্রহণে মনোযোগী না হইয়া সদাসর্ব্বদা অপর বালকগণকে বিষ্ণুর উপাসনা-প্রণালী শিখাইতে নিযুক্ত রহিলেন। আচার্য্যগণ যখন এই ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা অতিশয় ভীত হইলেন। কারণ, তাঁহারা প্রবল-প্রতাপ রাজা হিরণ্যকশিপুকে অতিশয় ভয় করিতেন—অতএব, তাঁহারা প্রহ্লাদকে উক্ত অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিষ্ণু-উপাসনা ও তদ্বিষয়ক উপদেশদান প্রহ্লাদের নিকট শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল—সুতরাং তিনি কিছুতেই উহা ত্যাগ করিতে পারিলেন

না। তাঁহারা তখন নিজেদের দোষক্ষালনার্থ রাজার নিকট গিয়া এই ভয়ঙ্কর সমাচার নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার পুত্র যে কেবল নিজেই বিষ্ণুর উপাসনা করিতেছে, তাহা নহে, অপর বালকগণকেও বিষ্ণুর উপাসনা শিক্ষা দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

যখন রাজা ষণ্ডামর্কের নিকট পুত্রের এই চরিত্র শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজসমীপে আহ্বান করিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া বিষ্ণুর উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, দৈত্যরাজ আমিই এক্ষণে ত্রিভুবনের অধীশ্বর—অতএব আমিই একমাত্র উপাস্য—কিন্তু এই উপদেশে কোন ফল হইল না। বালক বার বার বলিতে লাগিলেন—সমগ্র জগতের অধীশ্বর সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য; কারণ, তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তিও বিষ্ণুরই ইচ্ছাধীন—আর যত দিন বিষ্ণুর ইচ্ছা হইবে, ততদিনই তাঁহার রাজত্ব। প্রহ্লাদের বাক্য শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া নিজ অনুচরবর্গকে তৎক্ষণাৎ পুত্রকে বধ করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাইয়াই দৈত্যগণ সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল, কিন্তু প্রহ্লাদের মন বিষ্ণুতে এতদূর নিবিষ্ট ছিল যে, তিনি শস্ত্রাঘাতজনিত বেদনা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

যখন প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেখিলেন যে, শস্ত্রাঘাতেও প্রহ্লাদের কিছু হইল না, তখন তিনি ভীত হইলেন। কিন্তু আবার দৈত্যজনোচিত অসৎ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া বালককে বিনাশ করিবার নানাবিধ পৈশাচিক উপায়ের আবিষ্কার করিতে

লাগিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহাকে হস্তিপদতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন—ইচ্ছা—হস্তী তাঁহাকে পদতলে পিষিয়া বিনাশ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যেমন লৌহপিণ্ডকে পিষিয়া ফেলা হস্তীর অসাধ্য, প্রহ্লাদের দেহও তদ্রূপ হস্তিপদতলে লৌহপিণ্ডবৎ পিষ্ট হইল না। সুতরাং প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার এই উপায় বিফল হইল। পরে রাজা প্রহ্লাদকে এক উচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন—তাঁহার এই আদেশও যথাযথ প্রতিপালিত হইল। কিন্তু প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন—সুতরাং—পুষ্প যেমন ধীরে ধীরে তৃণের উপর পতিত হয়, প্রহ্লাদও তদ্রূপ অক্ষতদেহে ভূতলে পতিত হইলেন। প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য অতঃপর বিষ, অগ্নি, অনশন, কূপপাতন, অভিচার ও অন্যান্য নানাবিধ উপায় একটির পরে একটি অবলম্বিত হইল, কিন্তু এই সকল উপায়ে কোন ফল হইল না। প্রহ্লাদের হৃদয়ে বিষ্ণু বাস করিতেন, সুতরাং কিছুতেই তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিল না।

অবশেষে কোনরূপে পুত্রের নিধনসাধন করিতে না পারিয়া রাজা আদেশ করিলেন, পাতাল হইতে নাগগণকে আহ্বান করিয়া সেই নাগপাশে প্রহ্লাদকে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তাহার উপর বড় বড় পাহাড় স্তূপাকার করিয়া দেওয়া হউক। এই অবস্থায় তাহাকে রাখা হউক—তাহা হইলে এখনই না হউক, কিছুকাল পরে সে বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু পিত্রাদেশে এই অবস্থায় পতিত হইয়াও তিনি "হে বিষ্ণো, হে জগৎপতে, হে সৌন্দর্য্যনিধে" ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহার পরম প্রিয়তম বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর চিন্তা ও তাঁহার

ধ্যান করিতে করিতে তিনি ক্রমে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার অতি নিকটে রহিয়াছেন, আরও চিন্তা করিতে করিতে অনুভব করিলেন, বিষ্ণু তাঁহার আত্মার ভিতরেই রহিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার অনুভব হইল যে, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই সকল বস্তু এবং তিনিই সর্ব্বত্র।

যেমন প্রহ্লাদের এইরূপ অদ্বৈতানুভব হইল, অমনি তাঁহার নাগপাশ খুলিয়া গেল—তাঁহার উপর যে পর্ব্বতরাশি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা গুঁড়াইয়া গেল, তখন সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠিল ও তিনি ধীরে ধীরে তরঙ্গরাজির উপর উত্থিত হইয়া নিরাপদে সমুদ্রকূলে নীত হইলেন। প্রহ্লাদ তখন, তিনি যে একজন দৈত্য, তাঁহার যে একটা মর্ত্ত্যদেহ আছে, একথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—তিনি উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি তাঁহা হইতেই নির্গত হইতেছে। জগতে এমন কিছু নাই, যাহা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে—তিনিই সমগ্র জগতের—সমগ্র প্রকৃতির শাস্তা-স্বরূপ। প্রহ্লাদ এইরূপ উপলব্ধিবলে সমাধিজনিত অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া বহুকাল যাপন করিলেন—বহুকাল পরে ধীরে ধীরে তাঁহার দেহজ্ঞান আবির্ভূত হইতে লাগিল, তিনি আপনাকে প্রহ্লাদ বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন। এইরূপে দেহজ্ঞান আবার আবির্ভূত হইলে তিনি দেখিতে লাগিলেন, ভগবান্ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, তখন জগতের সকল বস্তুই তাঁহার বিষ্ণু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু দেখিলেন যে তাঁহার শত্রু ভগবান্

বিষ্ণুর পরম ভক্ত নিজ পুত্র প্রহ্লাদের বিনাশার্থ যত প্রকার উপায় হইতে পারে, তৎসমুদয়ই বিফল হইল, তখন তিনি পরম ভীতগ্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন দৈত্যরাজ পুনরায় পুত্রকে নিজ সন্নিধানে আনয়ন করাইলেন এবং নানাপ্রকার মিষ্টবাক্য বলিয়া তাঁহাকে আবার বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদ পূর্ব্বে পিতার নিকট যেরূপ উত্তর দিতেন, এক্ষণেও সেই একই উত্তর তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল। হিরণ্যকশিপু ভাবিলেন, শিক্ষা ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার শিশুজনোচিত এই সব খেয়াল চলিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি পুনরায় প্রহ্লাদকে ষণ্ডামর্কের হস্তে অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অনুমতি করিলেন। ষণ্ডামর্কও প্রহ্লাদকে লইয়া রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই উপদেশ প্রহ্লাদের ভাল লাগিত না, তিনি সুযোগ পাইলেই সহপাঠী বালকগণকে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

যখন হিরণ্যকশিপুর নিকট এই সমাচার পঁহুছিল যে, প্রহ্লাদ নিজ সহপাঠী শিশুগণকে পর্য্যন্ত বিষ্ণুর উপাসনা করিতে শিখাইতেছে, তখন তিনি আবার ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং প্রহ্লাদকে নিজ সমীপে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইতে এবং বিষ্ণুকে অকথ্য ভাষায় নিন্দা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ তখনও দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন যে, "বিষ্ণু সমগ্র জগতের অধীশ্বর, তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপী এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য।" এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রে

দুষ্ট, যদি তোর বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তিনি এই স্তম্ভে নাই কেন?" প্রহ্লাদ বিনীতভাবে কহিলেন, "হাঁ, তিনি অবশ্যই এই স্তম্ভে আছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই যদি হয়, তবে আমি এই তোকে তরবারি আঘাত করিতেছি, তোর বিষ্ণু তোকে রক্ষা করুক।" এই বলিয়া দৈত্যরাজ তরবারিহস্তে প্রহ্লাদের দিকে বেগে অগ্রসর হইলেন এবং স্তম্ভের উপর প্রচণ্ড তরবারির আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্তম্ভমধ্য হইতে বজ্রনির্ঘোষ উত্থিত হইল, বিষ্ণু নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্তম্ভমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। সহসা এই ভীষণ মূর্ত্তিদর্শনে চকিত ও ভীত হইয়া দৈত্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে ভগবান্ নৃসিংহ কর্ত্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলেন।

তখন স্বর্গ হইতে দেবগণ আগমন করিয়া বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদও ভগবান্ নৃসিংহদেবের চরণে নিপতিত হইয়া পরম মনোহর স্তব করিলেন। তখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া প্রহ্লাদকে বলিলেন, "বৎস প্রহ্লাদ, তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর। বৎস, তুমি আমার পরম প্রিয়পাত্র। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই আমার নিকট প্রার্থনা কর।" প্রহ্লাদ ভক্তি-গদগদস্বরে বলিলেন, "প্রভো, আমি আপনাকে দর্শন করিলাম, এক্ষণে আমার আর কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? আপনি আর আমাকে ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইবেন না।" ভগবান্ পুনরায় কহিলেন, প্রহ্লাদ, তোমার নিষ্কামভক্তি দেখিয়া পরম প্রীত হইলাম। তথাপি আমার দর্শন

বৃথা হয় না। অতএব আমার নিকট যে কোন একটি বর প্রার্থনা কর।" তখন প্রহ্লাদ বলিলেন,—

যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ বিষ্ণুপুরাণ, ১,২০,১৯।

অর্থাৎ অজ্ঞানী ব্যক্তির বিষয়ে যেরূপ তীব্র আসক্তি থাকে তোমাকে স্মরণ করিবার সময় যেন সেইরূপ তীব্র অনুরাগ আমার হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়।

তখন ভগবান্ কহিলেন, "বৎস প্রহ্লাদ, যদিও আমার পরম ভক্তগণ ইহলোক বা পরলোকের কোনরূপ কাম্যবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না, তথাপি তুমি আমার আদেশে সর্ব্বদা আমাতে মন রাখিয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যভোগ ও পুণ্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর। যথাসময়ে কল্পান্তে দেহপাত হইলে আমায় লাভ করিবে।" এইরূপে প্রহ্লাদকে বর দিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তখন ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণ প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্ব স্ব লোকে প্রস্থান করিলেন।

জগতের মহত্তম আচার্য্যগণ

(১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি প্যাসাডেনা সেক্সপিয়র
সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা)

হিন্দুদের মতানুসারে এই জগৎ তরঙ্গাকারে বিভিন্ন যুগপ্রবাহে চলিতেছে। তরঙ্গ একবার উঠিল, সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিল, তারপর পড়িল, কিছুকালের জন্য যেন পড়িয়া রহিল—আবার প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উঠিবে—এইরূপে উত্থানের পর উত্থান ও পতনের পর পতন—এইরূপে চলিবে! সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টি সম্বন্ধে যাহা সত্য, উহার প্রত্যেক অংশ বা ব্যষ্টি সম্বন্ধেও তাহাই। মনুষ্যসমাজের সকল ব্যাপার এইরূপে তরঙ্গ গতিতেই হইয়া থাকে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসও এই সত্যেরই সাক্ষ্য দিয়া থাকে—বিভিন্ন জাতিসমূহ উঠিতেছে আবার পড়িতেছে—উত্থানের পর পতন হইতেছে—ঐ পতনের পর আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিতে পুনরুত্থান হইয়া থাকে। এইরূপ তরঙ্গগতি সদাই চলিয়াছে। ধর্ম্মজগতেও এইরূপ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে এইরূপ উত্থান পতন হইয়া থাকে। জাতিবিশেষের অধঃপতন হইল—বোধ হইল যেন উহার জীবনীশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু ঐ অবস্থায় উহা ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতে থাকে, ক্রমে নববলে বলীয়ান্ হইয়া আবার প্রবল বেগে জাগিয়া উঠে।

তখন এক মহাতরঙ্গের আবির্ভাব হয়—সময়ে সময়ে উহা মহাবন্যার আকার ধারণ করিয়া আসে, আর সর্ব্বদাই দেখা যায়, ঐ তরঙ্গের শীর্ষদেশে এক মহাপুরুষমূর্ত্তি চতুর্দ্দিক স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। একদিকে তাঁহারই শক্তিতে সেই তরঙ্গের, সেই মহাজাতির অভ্যুত্থান, অপর দিকে আবার যে সকল শক্তি হইতে ঐ তরঙ্গের উদ্ভব, তিনিও তাহাদেরই ফলস্বরূপ—উভয়েই যেন পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করিতেছে—সুতরাং তাঁহাকে এক হিসাবে স্রষ্টা বা জনক, আবার অপর হিসাবে সৃষ্ট বা জন্য বলা যাইতে পারে। তিনি সমাজের উপর তাঁহার প্রবল শক্তি প্রয়োগ করেন, আবার তিনি যে শক্তির আধাররূপে অভ্যুদিত হন, সমাজই উহার কারণ। ইঁহারাই জগতের মহামনীষিবৃন্দ, ইঁহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য—ঋষি—মন্ত্রদ্রষ্টা—শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহের বার্ত্তাবহ—ঈশ্বরাবতার।

কতকগুলি লোকের ধারণা—জগতে ধর্ম্ম কেবল একটি হওয়াই সম্ভব—তাঁহাদের মতে ধর্ম্মাচার্য্য বা ঈশ্বরাবতারও একজন মাত্রই হইতে পারেন—কিন্তু এ ধারণা সত্য নহে। এই সকল মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলেই দেখা যায়, প্রত্যেকেই যেন একটি—কেবল একটি অংশ মাত্র অভিনয় করিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট,—যেমন সকল সুরের সমন্বয়েই ঐক্যতানের সৃষ্টি, কেবল একটি সুরে নহে। বিভিন্ন জাতিসমূহের জীবনালোচনায়ও দেখা যায়, কোন জাতিবিশেষই কখন সমগ্র জগতের সমগ্র ভোগরাশির অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। কোন জাতিই সাহস করিয়া বলিতে পারে না যে, আমরাই কেবল

সমগ্র জগতের সমগ্র ভোগের অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট এই জাতীয় ঐক্যতানে প্রত্যেক বিভিন্ন জাতিই নিজ নিজ অংশবিশেষের অভিনয় করিতে আসিয়াছে। প্রত্যেক জাতিকেই ব্রতবিশেষ উদ্‌যাপন করিতে হয়, কর্ত্তব্যবিশেষ সমাধা করিতে হয়। এই সমুদয়ের সমষ্টিই মহা সমন্বয়—মহা ঐক্যতানস্বরূপ।

জাতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, এই সকল মহাপুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। ইঁহাদের মধ্যে কেহই চিরকালের জন্য সমগ্র জগতে আধিপত্য বিস্তার করিতে আসেন নাই। এ পর্য্যন্ত কেহই ইহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, ভবিষ্যতেও হইবেন না। প্রত্যেকেই মানবজাতির সমগ্র শিক্ষার একাংশ মাত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন, সুতরাং ইহা সত্য যে, কালে এই মহাপুরুষগণের প্রত্যেকেই জগৎ ও উহার ভাগ্যলিপি-বিধাতা হইবেন।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই আজন্ম সগুণ ধর্ম্মে, যাহাতে ব্যক্তি বিশেষই আদর্শ, এরূপ ধর্ম্মে বিশ্বাস। আমরা সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে —নানা মতামত সম্বন্ধে—অনেক কথা কহিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্যই যেন বলিয়া দেয়, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে প্রকটিত হইলেই আমরা তত্ত্ববিশেষের ধারণায় সমর্থ। আমরা তখনই ভাববিশেষের ধারণায় সমর্থ হই, যখন উহা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে প্রতিভাত আদর্শ পুরুষ-বিশেষের চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকটিত হয়। আমরা কেবল দৃষ্টান্তসহায়েই উপদেশ বুঝিতে পারি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা

সকলেই এতদূর উন্নত হইতাম যে, তত্ত্ববিশেষের ধারণা করিতে আমাদের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন না হইত, তবে অবশ্য খুব ভালই হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক ত আমরা ততদূর উন্নত নহি। সুতরাং স্বভাবতই অধিকাংশ মানবই এই অসাধারণ পুরুষগণের—এই ঈশ্বরাবতারগণের—খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ দ্বারা পূজিত এই অবতারগণের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। মুসলমানগণ গোড়া হইতেই এইরূপ উপাসনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন—তাঁহারা কোন প্রফেট বা ঈশ্বরদূত বা অবতারের উপাসনার, বা তাঁহাকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শনের একেবারে বিরোধী। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন প্রফেট বা অবতারের পরিবর্ত্তে তাঁহারা সহস্র সেণ্ট বা সাধু মহাপুরুষের পূজা করিতেছেন। যাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা তাহার ত আর অপলাপ করা চলে না। প্রকৃত কথা এই, আমরা ব্যক্তিবিশেষকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর এরূপ উপাসনা আমাদের পক্ষে হিতকর। তোমাদের অবতার যীশুখ্রীষ্টকে যখন লোকেরা বলিয়াছিল, 'প্রভু, আমাদিগকে সেই পরম পিতা পরমেশ্বরকে দেখান,' তিনি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, "যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিয়াছে।" তাঁহার এই কথাটি তোমরা স্মরণ করিয়া দেখিও। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তাঁহাকে মানব ব্যতীত অন্যভাবে কল্পনা করিতে পারে? আমরা তাঁহাকে কেবল মানবীয় ভাবের মধ্য দিয়াই দর্শন করিতে সমর্থ। এই গৃহের সর্ব্বত্রই ত আলোকপরমাণু স্পন্দিত হইতেছে—তবে আমরা উহা

দেখিতেছি না কেন? আমাদিগকে কেবল প্রদীপেই উহা দেখিতে হয়। এইরূপ ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, নির্গুণ, নিরাকার তত্ত্ববিশেষ হইলেও আমাদের বর্ত্তমান গঠন এরূপ যে, আমরা তাঁহাকে কেবল নররূপধারী অবতারের মধ্যেই উপলব্ধি করিতে, সাক্ষাৎকার করিতে পারি। যখনই এই মহাজ্যোতিষ্কগণের আবির্ভাব হয়, তখনই মানব ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। আর আমরা জগতে যে ভাবে আসিয়া থাকি, তাঁহারা সেভাবে আসেন না। আমরা আসি ভিখারীর মত—তাঁহারা আসেন সম্রাটের মত। আমরা এই জগতে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের ন্যায় আসিয়া থাকি, যেন আমরা পথ হারাইয়া গিয়াছি—কোন মতে পথ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা এখানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ঘুরিতেছি। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা জানি না। আমরা উহা বুঝিতে পারি না। আমরা আজ একরূপ কাজ করিতেছি, কাল আবার অন্যরূপ করিতেছি। আমরা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছি, ছোট ছোট পালকের মত বাত্যামুখে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছি; কিন্তু মানবজাতির ইতিবৃত্ত আলোচনায় দেখিবে, এই সকল অবতার যখনই আসিয়াছেন, আজন্ম তাঁহাদের জীবনব্রত যেন নির্দ্দিষ্ট হইয়াই আছে—তখন হইতেই যেন তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে কি করিতে হইবে, বুঝিয়াছেন ও স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনে কি কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা যেন তাঁহাদের সম্মুখে সুনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, আর তোমরা ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিও, তাঁহারা সেই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী হইতে কখনও

ক্ষণকালের জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ইহার কারণ এই, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট কোনও কার্য্য করিবার জন্যই আসিয়া থাকেন—তাঁহারা জগৎকে কিছু দিবার জন্য—জগতের নিকট কোন এক বার্ত্তা বহন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। আর তাঁহারা কখনও বিচার বা যুক্তিতর্ক করেন না। তোমরা কি কখনও শুনিয়াছ বা পড়িয়াছ যে, এই মহাপুরুষগণ, এই আচার্য্যবর্য্যগণ যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কখন যুক্তি তর্ক করিয়াছিলেন? তাঁহাদের মধ্যে কেহই কখন যুক্তিবিচার করেন নাই। তাঁহারা যাহা সত্য তাহা একেবারে বলিয়া যাইতেছেন। কেন তাঁহারা বিচার করিতে যাইবেন? তাঁহারা যে সত্য দর্শন করিতেছেন। আর কেবল তাঁহারা নিজেরা দর্শন করেন, তাহা নহে, অপরকেও উহা দেখাইয়া থাকেন। যদি তোমরা আমায় জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর আছেন কি না, আর আমি যদি উত্তরে বলি, হাঁ, তবে তখনই তোমরা আমার ঐরূপ বলিবার কি যুক্তি আছে, জিজ্ঞাসা করিবে—আর বেচারা আমাকে, তোমাদিগকে উহার কিছু যুক্তি দিবার জন্য আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তোমরা যীশুখ্রীষ্টের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে 'ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি?' তিনিও উত্তর দিতেন, 'হাঁ, আছেন বৈকি?' তারপর, 'তাঁহার অস্তিত্বের কিছু প্রমাণ আছে কি?'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চিত বলিতেন, 'এই যে প্রভু সম্মুখেই রহিয়াছেন—তাঁহাকে দর্শন কর।' অতএব তোমরা দেখিতেছ, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সকল মহাপুরুষের যে ধারণা

তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধির ফল, উহা যুক্তি বিচারলব্ধ নহে। তাঁহারা আর অন্ধকারে পথ হাতড়াইতেছেন না, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দর্শন-জনিত বলে বলীয়ান। আমি সম্মুখস্থ এই টেবিলটি দেখিতেছি—তুমি শত শত যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা কর না যে, টেবিলটি নাই কিন্তু তুমি কখনই উহার অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ আমি যে উহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমার এই বিশ্বাস যেরূপ দৃঢ় ও অচল অটল, তাঁহাদের বিশ্বাসও—তাঁহাদের আদর্শের উপর, তাঁহাদের নিজ জীবনব্রতের উপর, সর্ব্বোপরি তাঁহাদের নিজেদের উপর বিশ্বাসও তদ্রূপ দৃঢ় ও অচল। এই মহাপুরুষগণ যেরূপ প্রবল আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন অপর কাহাকেও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। লোকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাসী? তুমি কি পরলোক মান? তুমি কি এই মত অথবা ঐ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস কর?' লোকে এত সব বিশ্বাসের কথা কহে, কিন্তু বুঝে না যে, ইহাদের যাহা মূলভিত্তিস্বরূপ, সেই আত্মবিশ্বাসই যে আমার নাই। যে নিজের উপর বিশ্বাস করিতে পারে না, সে আবার অন্য কিছুতে বিশ্বাস করিবে, লোকে ইহা আশা করে কিরূপে? অমি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই নিঃসংশয় নহি। এই একবার ভাবিতেছি, আমি নিত্যস্বরূপ, কিছুতেই আমাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, আবার পরক্ষণেই আমি মৃত্যুভয়ে কাঁপিতেছি। এই ভাবিতেছি, আমি অজর অমর, পরক্ষণেই হয়ত একটা ভূত দেখিতে পাইয়া ভয়ে এমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম যে, আমি কে, কোথায় রহিয়াছি, আমি মৃত কি জীবিত সব

ভুলিয়া গেলাম। এই ভাবিতেছি আমি খুব ধার্ম্মিক, আমি খুব চরিত্রবলসম্পন্ন, পর মুহূর্ত্তেই এমন এক ধাক্কা খাইলাম যে, একেবারে চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়া গেলাম। ইহার কারণ কি ?— কারণ আর কিছুই নহে, আমি নিজের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছি, আমার চরিত্রবলরূপ মেরুদণ্ড ভগ্ন।

কিন্তু এই সকল মহান্ আচার্য্যগণের চরিত্রালোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের সকলের ভিতর এই একটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাইবে যে, তাঁহারা সকলেই নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাসসম্পন্ন। এরূপ বিশ্বাস অসাধারণ, সুতরাং আমরা উহা বুঝিতে পারি না। আর সেই কারণেই এই মহাপুরুষগণ নিজেদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, উহাকে আমরা নানা উপায়ে ব্যাখ্যা করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, আর তাঁহারা নিজেদের অপরোক্ষানুভূতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিশ সহস্র বিভিন্ন মতবাদ কল্পনা করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে ঐরূপ ভাবিতে পারি না, কাজেকাজেই আমরা যে তাঁহাদিগকে বুঝিতে পারি না, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে।

আবার তাঁহাদের এরূপ শক্তি যে, যখন তাঁহাদের মুখ হইতে কোন বাণী উচ্চারিত হয়, তখন জগৎ উহা শুনিতে বাধ্য হয়। যখন তাঁহারা কিছু বলেন, তাহার ভিতর কিছু ঘোরফের থাকে না, প্রত্যেক শব্দটি সোজা সরল ভাবে গিয়া লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করে, বোমার মত ফাটিয়া গিয়া সম্মুখে যাহা কিছু থাকে, তাহারই উপর নিজ অসীম প্রভাব বিস্তার করে। শুধু কথায় আছে কি, যদি তাহার পশ্চাতে সেই শক্তি না থাকে ? তুমি

কোন্ ভাষা কহিতেছ, কিরূপেই বা তোমার ভাষার শব্দ বিন্যাস করিতেছ, তাহাতে আসিয়া যায় কি? তুমি ব্যাকরণশুদ্ধ বা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী ভাষা বলিতেছ কি না, তাহাতে কি আসিয়া যায়? তোমার ভাষা নানা মনোহর অলঙ্কারবিন্যাসে উপাদেয় কি না, তাহাতেই বা কি আসিয়া যায়? প্রশ্ন এই, তোমার লোককে কিছু দিবার আছে কি না? ইহা কেবল কথা শুনা নহে, ইহা দেওয়া লওয়ার ব্যাপার। প্রথম প্রশ্ন এই, তোমার কিছু দিবার আছে কি? যদি থাকে তবে দাও। শব্দগুলি ত শুধু ঐ দান এক ব্যক্তি হইতে অপরে সঞ্চারিত করে মাত্র—উহারা শুধু ঐ দান সঞ্চারিত করিবার বিবিধ উপায় সমূহের মধ্যে অন্যতম। অনেক সময় কোন প্রকার কথাবার্ত্তা না কহিয়াই এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে ভাব সঞ্চারিত হইয়া থাকে। দক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রে আছে:—

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ॥

কি আশ্চর্য্য, দেখ ঐ বটবৃক্ষের মূলে যুবা গুরু ও বৃদ্ধ শিষ্যগণ বসিয়া রহিয়াছেন। মৌনই গুরুর শাস্ত্রব্যাখ্যান এবং তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কখন কখন এমনও হয় যে, তাঁহারা আদৌ বাক্যোচ্চারণই করেন না তথাপি তাঁহারা নিজ মন হইতে অপরের মনে সত্যতত্ত্ব সঞ্চারিত করেন। তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিপ্রাপ্ত—তাঁহারা চাপরাস পাইয়াছেন, তাঁহারা দূত হইয়া আসিয়াছেন—সুতরাং তাঁহারা অপরকে অনায়াসে হুকুম

করিয়া থাকেন, তোমাদিগকে সেই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া উহা প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তোমাদের শাস্ত্রে যীশুখ্রীষ্ট যেরূপ জোরের সহিত অধিকারপ্রাপ্ত পুরুষের ন্যায় উপদেশ দিতেছেন, তাহা কি তোমাদের স্মরণ হইতেছে না? তিনি বলিতেছেন—"অতএব তোমরা যাও—গিয়া জগতের সকল জাতিকে শিক্ষা দাও—আমি তোমাদিগকে যে সকল বিষয় আদেশ করিয়াছি, তাহাদিগকে সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দাও।" তাঁহার সকল উক্তির ভিতরই তাঁহার নিজের যে জগৎকে শিক্ষা দিবার বিশেষ কিছু আছে, তাহার উপর প্রবল বিশ্বাস দেখা যায়। জগতের লোকে যাঁহাদিগকে প্রফেট বা অবতার বলিয়া উপাসনা করে, সেই সকল মহাপুরুষের মধ্যেই এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সকল মহান্ আচার্য্যগণ এই পৃথিবীতে জীবন্ত ঈশ্বর-স্বরূপ। আমরা অপর আর কাহার উপাসনা করিব? আমি মনে মনে ঈশ্বরের ধারণা করিবার চেষ্টা করিলাম—কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়া দেখিলাম—কি এক মিথ্যা ক্ষুদ্র বস্তুর ধারণা করিয়া বসিয়াছি। এরূপ ঈশ্বরকে উপাসনা করিলে ত পাপই হইবে। কিন্তু যখনই আমি চক্ষু খুলি, এই মহাপুরুষগণের বাস্তব জীবনের বিষয় আলোচনা করি তখনই দেখিতে পাই, আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যতদূর ধারণা করিতে পারি, তদপেক্ষা উহা অনেক উচ্চতর। আমার মত লোক দয়ার ধারণা আর কতদূর করিবে? কোন লোক যদি আমার নিকট হইতে কোন বস্তু চুরি করে, আমি ত অমনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে জেলে

দিবার জন্ম প্রস্তুত হই। আমার আর ক্ষমার উচ্চতম ধারণা কতদূর হইবে? আমি নিজে যতটুকু গুণসম্পন্ন, তদপেক্ষা উচ্চতর ধারণা আর আমার হইতেই পারে না। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, নিজে দেহের বাহিরে লাফাইয়া যাইতে পারে? তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, নিজ মনের বাহিরে লাফাইয়া যাইতে পারে? কেহই নাই। তোমরা ঐশ্বরিক প্রেমের ধারণা আর কি করিবে—তোমরা বাস্তব জীবনে নিজেরা যেরূপ পরস্পরকে ভালবাসিয়া থাক, তদপেক্ষা উচ্চতর ধারণা কোথা হইতে করিবে? আমরা নিজেরা যাহা কখন উপলব্ধি করি নাই, তৎসম্বন্ধে আমরা কোন ধারণাই করিতে পারি না। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করিবার আমি যতটা চেষ্টা করি না কেন, তৎসমুদয় প্রতিপদেই বিফল হইবে। কিন্তু এই মহাপুরুষগণের জীবনরূপ প্রত্যক্ষ ব্যাপার আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, উহা কল্পনা করিয়া আমাদের ধারণা করিতে হয় না। তাঁহাদের জীবনালোচনায় আমরা প্রেম, দয়া, পবিত্রতার এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, যাহা আমরা কখন কল্পনায়ও আনিতে পারিতাম না। অতএব আমরা এই সকল নরদেবের চরণে পতিত হইয়া ইঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিব, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? আর, লোকে ইহা ব্যতীত আর কি করিতে পারে? আমি এমন লোক দেখিতে চাই, যে ব্যক্তি (সে মুখে নিরাকার তত্ত্বের কথা যতই বলুক না কেন) কার্য্যতঃ পূর্ব্বোক্তভাবে সাকার উপাসনা ব্যতীত অন্য কিছু করিতে সমর্থ। মুখে বলা আর কাজে করার মধ্যে অনেক

প্রভেদ। নিরাকার ঈশ্বর, নির্গুণতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে মুখে আলোচনা কর—বেশ কথা, কিন্তু এই সকল নরদেবই প্রকৃতপক্ষে সকল জাতির উপাস্য যথার্থ ঈশ্বর। এই সকল দেবমানবই চিরদিন জগতে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন, আর যতদিন মানব মানব থাকিবে, ততদিনই পূজিত হইবে। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই যথার্থ ঈশ্বর আছেন, যথার্থ ধর্ম্মজীবন আছে, এই বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস হয়, আমাদের ঈশ্বরলাভের—ধর্ম্মজীবনলাভের আশা হয়। কেবল অস্পষ্ট রহস্যময় তত্ত্ব লইয়া কি ফল?

তোমাদের নিকট আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহার সার নিষ্কর্ষ এই যে, আমার জীবনে উক্ত সকল অবতারকেই পূজা করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল অবতার আসিবেন, তাঁহাদিগকেও পূজা করিবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। সন্তান যেকোন বেশে তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হউক না, মাতা তাহাকে অবশ্যই চিনিতে পারেন। যদি না পারেন, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তিনি কখনই তাহার মা নহেন। তোমাদের মধ্যে যাহারা মনে করে, কোন একটি বিশেষ অবতারেই তাহারা যথার্থ সত্য ও ঈশ্বরের অভিব্যক্তি দেখিতেছে, যাহা অপরে দেখিতে পাইতেছে না, তাহাদের সম্বন্ধে স্বভাবতঃ এই সিদ্ধান্তই আমার মনে উদয় হয় যে, তাহারা কোন অবতারের ঈশ্বরত্বই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে নাই—তাহারা কেবল কতকগুলি শব্দসমষ্টি গলাধঃকরণ করিয়াছে মাত্র, আর যেমন লোকে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হইয়া সেই দলের যে মত তাহাই আপনার মত বলিয়া প্রচার করে, ইহারাও তদ্রূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের সহিত যোগ দিয়া সেই সম্প্রদায়ের

মতামতগুলি আপনাদের বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু উহা ত বাস্তবিক ধর্ম্ম নহে। জগতে এমন অজ্ঞব্যক্তিও অনেক আছে, যাহারা নিকটে উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট জল থাকিতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের খনিত বলিয়া লবণাক্ত কূপের জলই পান করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমি আমার জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইতে আমি এই শিখিয়াছি যে লোকে ধর্ম্মকে যে সকল দোষে দোষী বলে, প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ধর্ম্মের দোষ নাই। কোন ধর্ম্মই কখন মানুষের উপর অত্যাচার করে নাই, কোন ধর্ম্মই ডাইনী অপবাদ দিয়া স্ত্রীলোককে পুড়াইয়া মারে নাই, কোন ধর্ম্মই কখন এতদ্বিধ অন্যায় কার্য্যের পোষকতা করে নাই। তবে লোককে এ সকল কার্য্যে উত্তেজিত করিল কিসে?—কূটরাষ্ট্রনীতিই মানুষকে এই সকল অন্যায়কার্য্য করাইয়াছে, ধর্ম্ম কখনই নহে। আর যদি ঐ কূটরাষ্ট্রনীতি ধর্ম্মের নাম ধারণ করে, তবে তাহাতে দোষ কাহার?

এইরূপ যখনই কোন ব্যক্তি উঠিয়া বলে, আমার ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম, আমার অবতারই একমাত্র সত্য অবতার, সে ব্যক্তির কথা কখনই ঠিক নহে, সে ধর্ম্মের "ক, খ" পর্য্যন্ত জানে না। ধর্ম্ম কেবল কথার কথা বা মতামত নহে, অথবা অপরের সিদ্ধান্তে কেবল বুদ্ধির সায় দেওয়া নহে। ধর্ম্মের অর্থ—প্রাণে প্রাণে সত্য উপলব্ধি, ধর্ম্ম অর্থে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে স্পর্শ করা, ধর্ম্ম অর্থে প্রাণের অনুভব, উপলব্ধি করা যে, আমি আত্মাস্বরূপ, আর সেই অনন্ত পরমাত্মা এবং তাঁহার সকল অবতারের সহিত আমার একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। যদি তুমি বাস্তবিকই সেই

পরমপিতার গৃহে প্রবেশ করিয়া থাক, তুমি অবশ্য তাঁহার সন্তান-গণকেও দেখিয়াছ—তবে তাহাদিগকে চিনিতে পারিতেছ না কেন? যদি চিনিতে না পার, তবে নিশ্চিত তুমি সেই পরম-পিতার গৃহে প্রবেশ কর নাই। সন্তান যে কোন বেশে মায়ের সম্মুখে আসুক, মাতা তাহাকে অবশ্য চিনিতে পারেন—সন্তানের যতই ছদ্মবেশ থাকুক, মায়ের নিকট সন্তান কখন আপনাকে লুক্কায়িত রাখিতে পারে না। তোমরা সকল দেশের, সকল যুগের ধর্ম্মপ্রাণ মহান নরনারীগণকে চিনিতে শিখ, আর ইহাও লক্ষ্য কর যে, বাস্তবিক তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সেখানেই প্রকৃত ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে, যেখানেই এই ব্রহ্মসংস্পর্শ, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে, যেখানেই আত্মা সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেইখানেই দেখিবে, সেই ব্যক্তির মন এরূপ উদারভাবাপন্ন হইয়াছে যে, সে সর্ব্বত্রই সেই ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দেখিতে সমর্থ হইয়াছে।

এমন সময় ছিল যখন মুসলমানগণ এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অপরিণত এবং সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ছিলেন, যখন তাঁহারা যাহা কিছু তাঁহাদের উপাসনাপদ্ধতির বহির্ভূত হইত, সমস্তই ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিতে এবং যে কোনও গ্রন্থে অন্যবিধ মত প্রচারিত হইত সে সকলকেই পুড়াইয়া ফেলিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তথাপি সেই যুগেও যে সকল মুসলমান দার্শনিক-প্রকৃতির ছিলেন, তাঁহারা এবম্বিধ ধর্ম্মান্ধতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং এতদ্দ্বারা ইহাই দেখাইয়াছিলেন যে তাঁহারা ব্রহ্মসংস্পর্শলাভে ধন্য হইয়া-ছিলেন, এবং চিত্তের সেই উদারতা লাভ করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা

তাঁহারা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আজকাল যেমন ক্রমবিকাশবাদের কথা শুনা যায়, তেমনি আর একটি বিষয় মনুষ্যসমাজে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে—উহার নাম ক্রমাবনতি বা পূর্ব্বাবস্থায় পুনরাবর্ত্তন (Atavism)। ধর্ম্মবিষয়েও দেখা যায়, আমরা অনেক সময় উদারতরভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার প্রাচীন সঙ্কীর্ণ মতের দিকে ফিরিয়া আসি। কিন্তু প্রাচীন, একঘেয়ে ভাব আশ্রয় না করিয়া, আমাদের নূতন কিছু চিন্তা করিবার চেষ্টা করা উচিত, তাহাতে ভুল থাকে, থাকুক। নিশ্চেষ্ট জড়ের ন্যায় থাকা অপেক্ষা ইহা ঢের ভাল। লক্ষ্যবেধের চেষ্টা তোমরা সকলেই কেন না করিবে? বিফল হইয়া হইয়াই ত আমরা জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিয়া থাকি। অনন্ত সময় পড়িয়া রহিয়াছে সুতরাং ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? এই দেয়ালটাকে দেখ দেখি। ইহাকে কি কখন মিথ্যা কথা বলিতে শুনিয়াছ? কিন্তু উহা যে দেয়াল সেই দেয়ালই রহিয়াছে, কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। মানুষ মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, আবার সেই মানুষই দেবতাও হইয়া থাকে। কিছু করা চাই—হউক উহা অন্যায়, কিছু না করা অপেক্ষা ত উহা ভাল। গরুতে কখন মিথ্যা বলে না, কিন্তু উহা চিরকাল সেই গরুই রহিয়াছে। যাহাই হউক, কিছু কর। মাথা খাটাইয়া কিছু ভাবিতে শিখ; ভুল হউক, ঠিক হউক, ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কিছু চিন্তা কর দেখি। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই ভাবে চিন্তা করেন নাই বলিয়া কি আমাকে চুপ করিয়া

বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে অনুভবশক্তি ও চিন্তাশক্তি সমুদয় হারাইয়া ফেলিতে হইবে? তাহা অপেক্ষা ত মরাই ভাল। আর যদি আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা জীবন্ত ধারণা, একটা নিজের ভাব কিছু না থাকে, তবে আর বাঁচিয়া লাভ কি? নাস্তিকদের বরং কিছু হইবার আশা আছে, কারণ যদিও তাহারা অন্য সকল লোক হইতে ভিন্নমতাবলম্বী, তথাপি তাহারা নিজে নিজে চিন্তা করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি নিজে নিজে কখনও চিন্তা করে না, তাহারা এখনও ধর্ম্মরাজ্যে পদার্পণ করে নাই। তাহারা ত শুধু কোনরূপে Jelly-fish* এর মত নামমাত্র জীবনধারণ করিতেছে।

তাহারা কখনও চিন্তা করিবে না, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ধর্ম্মের জন্য বড় ব্যস্ত নহে। কিন্তু যে অবিশ্বাসী নাস্তিক, সে ধর্ম্মের জন্য ব্যস্ত—সে উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অতএব ভাবিতে শিখ, ঈশ্বরাভিমুখে প্রাণপণে অগ্রসর হও। অকৃতকার্য্য হইলে—তাহাতেই বা কি? স্বরূপ চিন্তা বা ভাবনা করিতে গিয়া যদি কোন অদ্ভুত মত আশ্রয় করিতে হয়, তাহাতেই বা কি? যদি লোকে তোমায় কিম্ভূতকিমাকার বলিবে বলিয়া তোমার ভয় হয়, তবে উক্ত মতামত নিজ মনের ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দাও, অপরের নিকট উহা প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাই হউক, কিছু কর। ভগবানের দিকে প্রাণপণে অগ্রসর হও, অবশ্যই আলোক আসিবে। যদি কোন ব্যক্তি সারাজীবন আমায় হাতে

---

* নিম্নতম শ্রেণীর সামুদ্রিক জীববিশেষ, উহা দেখিতে জেলি বা মোরব্বার মত।

তুলিয়া খাওয়াইয়া দেয়, কালে আমি নিজের হাতের ব্যবহার ভুলিয়া যাইব। গড্ডালিকাপ্রবাহের মত একজন যে দিকে যাইতেছে, সকলেই সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার ফল ত আধ্যাত্মিক মৃত্যু। নিশ্চেষ্টতার ফল ত মৃত্যু। ক্রিয়াশীল হও। আর যেখানেই ক্রিয়াশীলতা, তথায় বিভিন্নতা অবশ্যই থাকিবে। বিভিন্নতা আছে বলিয়াই ত জীবন এত উপভোগ্য—বিভিন্নতাই জগতের সর্ব্ববস্তুর সৌন্দর্য্য, সর্ব্ববস্তুর কলাকৌশলস্বরূপ—বিভিন্নতাই জগতে সমুদয় বস্তুকে সুন্দর করিয়াছে। এই বিভিন্নতাই জীবনের মূল, উহাই জীবনের চিহ্ন, সুতরাং আমরা উহা হইতে ভয় পাইব কেন?

এইবার আমরা অবতারদিগের ভাব কতকটা বুঝিবার পথে অগ্রসর হইতেছি। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, পূর্ব্বোক্তভাবে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও যাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া মোটে মাথা না ঘামাইয়া জীবনধারণ করেন, তাঁহাদের মত না হইয়া যেখানেই লোকে ধর্ম্ম-তত্ত্ব লইয়া যথার্থই একটু মাথা ঘামাইয়াছেন, সেইখানেই ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রেমের উদয় হইয়াছে, তথায়ই আত্মা ঈশ্বরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তদ্ভাব-ভাবিত হইয়াছে এবং যেন মধ্যে মধ্যে, জীবনের মধ্যে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেই পরম বস্তুর আভাস পাইয়াছে, তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছে।

তখনই

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥*

অর্থাৎ, হৃদয়ের কুটিলভাবসমূহ সরল হইয়া যায়, সমুদয় সংশয়

* মুণ্ডকোপনিষদ্—২. ২. ৮।

ছিন্ন হইয়া যায়, কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া যায় ; কারণ, তিনি তখন সেই পুরুষকে দেখিয়াছেন, তিনি দূর হইতেও অতিদূরে এবং নিকট হইতেও অতি নিকটে।

ইহাই ধর্ম্ম, ইহা ছাড়া ধর্ম্ম কিছু নাই। আর যাহা কিছু তাহা কেবল মত মতান্তরমাত্র এবং এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অবস্থায় যাইবার বিভিন্ন উপায় মাত্র। আমাদের কিন্তু এখন অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে—ফল যাহা কিছু ছিল, সব নর্দ্দামায় পড়িয়া গিয়াছে, আমরা এখন ঝুড়িটা লইয়া টানাটানি করিতেছি মাত্র।

দুইজন লোক ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করিতেছে, তাহাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর দেখি,—তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছ, তোমরা যে সকল অতীন্দ্রিয় বিষয় লইয়া বিবাদ করিতেছ, তাহা কি তোমরা দেখিয়াছ? একজন বলিতেছে,—যীশুখ্রীষ্টই একমাত্র অবতার। 'আচ্ছা, তুমি কি যীশুখ্রীষ্টকে দেখিয়াছ?' সে অবশ্য বলিবে, 'আমি দেখি নাই।' 'আচ্ছা বাপু, তোমার পিতা কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন?'—'না মহাশয়।' 'তোমার পিতামহ কি দেখিয়াছেন?' 'না মহাশয়।' 'তবে কি লইয়া বৃথা বিবাদ করিতেছ? ফলগুলি সব নর্দ্দমায় পড়িয়া গিয়াছে, এখন ঝুড়ি লইয়া টানাটানি করিতেছ মাত্র।' যাঁহাদের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে, এমন নরনারীর এইরূপে বিবাদ করিয়া লজ্জা বোধ করা উচিত।

এই সকল মহাপুরুষ ও অবতারগণ সকলেই মহান্ ও সকলেই সত্য। কেন? কারণ, প্রত্যেকেই এক একটি মহান্ ভাব প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় অবতারগণের কথা

ধর। তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ধর্ম্মসংস্থাপক। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের কথা ধরা যাউক। তোমরা সকলেই গীতা পড়িয়াছ, সুতরাং তোমরা জান, সমগ্র গ্রন্থটির মধ্যে মূল কথাটা এই—অনাসক্তি। সর্ব্বদা অনাসক্ত থাক। হৃদয়ের ভালবাসায় কেবল একজনের মাত্র অধিকার। কাহার অধিকার?—তাঁহারই অধিকার, যাঁহার কখনও কোন পরিণাম নাই। কে তিনি?—ঈশ্বর। ভ্রান্তি বশতঃ কোন পরিণামশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি হৃদয় অর্পণ করিও না; কারণ, তাহা হইতেই দুঃখের উদ্ভব। তুমি মনুষ্য-বিশেষের প্রতি হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু যদি সে মরিয়া যায়, ফলস্বরূপ তোমার দুঃখ লাভ হইবে। তুমি বন্ধুবিশেষকে ঐরূপে হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু কাল সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তুমি তোমার স্বামীকে হৃদয় অর্পণ করিতে পার, কিন্তু কাল তিনি হয়ত তোমার সহিত বিবাদ করিয়া বসিবেন। তুমি স্ত্রীকে হৃদয় সমর্পণ করিতে পার, কিন্তু সে হয়ত কাল বাদে পরশু মরিয়া যাইবে। এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন, সেই প্রভু ভগবানই একমাত্র অপরিণামী। তাঁহার ভালবাসার কখন অভাব হয় না। আমরা যেখানেই থাকি এবং যাহাই করি না কেন, তিনি সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি সমান দয়াময়, তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি সমান প্রেমপূর্ণ। তাঁহার কখনই কোনরূপ পরিণাম নাই। আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তিনি কখনই রাগ করেন না। ঈশ্বর আমাদের উপর রাগ করিবেন কিরূপে? তোমার খোকা অনেক প্রকার দুষ্টামি করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি কি তাহার উপর

রাগ করিয়া থাক? আমাদের ভবিষ্যতে কি অবস্থা হইবে, তাহা কি ঈশ্বর জানেন না? তিনি নিশ্চিত জানেন, শীঘ্র বা বিলম্বে আমরা সকলেই পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইব। সুতরাং তিনি আমাদের শত দোষ হইলেও ধৈর্য্য ধরিয়া থাকেন, তাঁহার ধৈর্য্যগুণ অসীম। আমাদের তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, আর জগতের যত প্রাণী আছে, তাহাদিগকে কেবল তাঁহার প্রকাশ বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। ইহাই মূলমন্ত্র করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্ত্রীকে অবশ্য ভালবাসিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রীর জন্য নহে।

'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।'*

অর্থাৎ স্বামীকে যে স্ত্রী ভালবাসে, তাহা স্বামীর জন্য নহে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সেই আত্মা আছেন বলিয়া—ভগবান্ আছেন বলিয়া পতি প্রিয় হইয়া থাকেন।

বেদান্তদর্শন বলেন, পতিপত্নীর প্রেমে বা জননীর পুত্রবাৎসল্যে যদিও স্ত্রী ভাবে, আমি স্বামীকেই ভালবাসিতেছি—অথবা জননী মনে করেন—আমি পুত্রগণকে ভালবাসিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ঐ পতির ভিতর বা পুত্রগণের ভিতর অবস্থান করিয়া পত্নীকে ও জননীকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি একমাত্র আকর্ষণের বস্তু, তিনি ব্যতীত আকর্ষণের বস্তু আর কেহই নাই, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রী ইহা জানে না; কিন্তু অজ্ঞাতসারে সেও ঠিক পথে চলিয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসিতেছে। তবে অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইলে, উহা হইতে দুঃখ কষ্টের উদ্ভব হইয়া থাকে।

---

* বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪, ৫।

জ্ঞাতসারে ইহার অনুষ্ঠানে মুক্তি। আমাদের শাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন। যেখানেই প্রেম—যেখানেই একবিন্দু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বুঝিতে হইবে ঈশ্বর রহিয়াছেন; কারণ, ঈশ্বর রসস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। যেখানে তিনি নাই সেখানে প্রেম থাকিতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশসমূহ সব এই ভাবের। তিনি সমগ্র ভারতের মধ্যে,—সমগ্র হিন্দুজাতির ভিতর এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুরা যে কার্য্য করে, এমন কি জলপান করিবার সময়ও বলে,—যদি কার্য্যের কোনও শুভ ফল থাকে, তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করিলাম। বৌদ্ধগণ কোন সৎকর্ম্ম করিবার সময় বলিয়া থাকে, এই সৎকর্ম্মের ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হউক, আর জগতের দুঃখকষ্ট সমুদয় আমাতে আসুক। হিন্দু বলে, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, আর ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান—সকল আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ, সুতরাং যদি আমি সমুদয় সৎকর্ম্মের ফল তাঁহাকে সমর্পণ করি, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ—আর ঐ ফল নিশ্চিত সমগ্র জগৎ পাইবে।

শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার ইহা এক দিক; তাঁহার অন্য শিক্ষা কি? এই জগতের মধ্যে বাস করিয়া যিনি কার্য্য করেন, অথচ যিনি তাঁহার সমুদয় কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি কখন অশুভে লিপ্ত হন না। যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তিও তদ্রূপ পাপে লিপ্ত হয় না।

প্রবল কর্ম্মশীলতা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের আর এক দিক। গীতা বলিতেছেন, দিবারাত্র কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর। তোমরা

বলিতে পার,—তবে শান্তি কোথায়? যদি সারাজীবন ছেক্‌রা গাড়ীর ঘোড়ার মত কাজ করিয়া যাইতে হয় আর ঐরূপে গাড়ীতে জোতা অবস্থায় মরিতে হয়, তবে আর জীবনে শান্তিলাভ কোথায় হইল? শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—"হাঁ, তুমি শান্তিলাভ করিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র হইতে পলায়ন শান্তির পথ নহে।" যদি পার সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছাড়িয়া পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া থাকগে দেখি। গিয়া দেখিবে, মন সেখানেও সুস্থির নহে—ক্রমাগত এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। জনৈক ব্যক্তি একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'আপনি কি একান্ত নিরুপদ্রব মনোরমস্থান পাইয়াছেন? আপনি হিমালয়ে কত বৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছেন?' সন্ন্যাসী উত্তরে বলিলেন,—'চল্লিশ বৎসর।' তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন হিমালয়ে ত অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান রহিয়াছে, আপনি উহাদের মধ্যে একটি নির্ব্বাচন করিয়া অনায়াসে থাকিতে পারিতেন। আপনি কেন তাহা করিলেন না?' সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন,—'এই চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমার মন আমাকে উহা করিতে দেয় নাই।' আমরা সকলেই বলিয়া থাকি বটে যে, আমরা শান্তিতে থাকিব, কিন্তু মন আমাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

তোমরা সকলেই সেই তাতার-ধরা * সৈনিক পুরুষের গল্প শুনিয়াছ। জনৈক সৈনিকপুরুষ নগরের বহির্দ্দেশে গিয়াছিল।

* ইহার ঠিক অনুরূপ হিন্দি প্রবাদ—"হাম্ তো কম্‌লীকো ছোড় দিয়া, কম্‌লী তো হাম্‌কো ছোড়তা নহী," বেচারা যাহাকে কম্বল মনে করিয়া ধরিতে গিয়াছিল দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটি একটি ভালুক।

সে ফিরিয়া সেনাবাসের নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—'আমি একজন তাতারকে ধরিয়াছি।' ভিতর হইতে একজন বলিল, 'উহাকে ভিতরে লইয়া আইস।' সৈনিক বলিল,—সে আসিতেছে না, মহাশয়।' 'তবে তুমি একলাই ভিতরে চলিয়া আইস।' 'সে যাইতে দিতেছে না মহাশয়।' আমাদের মনের ভিতরেও ঠিক এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। আমরা সকলেই 'তাতার ধরিয়াছি'। আমরাও উহাকে থামাইতে পারিতেছি না, উহাও আমাদিগকে শান্ত হইতে দিতেছে না। আমরা সকলেই যে পূর্ব্বোক্ত সৈনিক পুরুষের ন্যায় 'তাতার ধরিয়াছি।' আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, শান্তস্বভাব অবলম্বন কর ; স্থির, শান্ত হইয়া থাক, ইত্যাদি। একথা ত একটা শিশুও বলিতে পারে, আর মনে করে, সে ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা করা বড় কঠিন। আমি এ বিষয় চেষ্টা করিয়াছি। আমি সব কর্ত্তব্য ফেলিয়া দিয়া শৈলশিখরে পলায়ন করিয়াছিলাম, গভীর অরণ্যে ও পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই ; কারণ আমিও 'তাতার ধরিয়াছিলাম', আমার সংসার আমার সঙ্গে সঙ্গে বরাবর চলিয়াছিল। আমার মনের মধ্যেই ঐ 'তাতার' রহিয়াছে, অতএব বাহিরে কাহারও উপর দোষ চাপান ঠিক নহে। আমরা বলিয়া থাকি বাহিরের এই অবস্থাচক্র আমার অনুকূল, ঐ অবস্থাচক্র আমার প্রতিকূল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সকল গোলযোগের মূল ঐ 'তাতার' আমার ভিতরেই রহিয়াছে। উহাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।

এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন,—'কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিও না, মানুষের মত উহাদের সাধনে অগ্রসর হও, উহাদের ফলাফল কি হইবে, তাহা ভাবিও না।' ভৃত্যের প্রশ্ন করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই, সৈনিক পুরুষের বিচার করিবার অধিকার নাই। কর্ত্তব্য পালন করিয়া অগ্রসর হইতে থাক, তোমাকে যে কার্য্য করিতে হইতেছে, তাহা বড় কি ছোট, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিও না। কেবল নিজ মনকে প্রশ্ন কর, সে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতেছে কি না। যদি তুমি নিঃস্বার্থ হও, তবে কিছুতেই কিছু আসিয়া যাইবে না, কিছুতেই তোমার উন্নতির প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। কাজে ডুবিয়া যাও—হাতের সাম্‌নে যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহাই করিয়া যাও। এইরূপ করিলে তুমি ক্রমে ক্রমে সত্য উপলব্ধি করিবে।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।—গীতা, ৪, ১৮।

ভাবার্থ—যিনি প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্যে শান্তি সম্ভোগ করেন, আবার পরম নিস্তব্ধতা ও শান্তির ভিতর প্রবল কর্ম্মশীলতা দেখেন, তিনিই যোগী, তিনিই মহাপুরুষ, তিনিই পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, সিদ্ধ হইয়াছেন।

এক্ষণে তোমরা দেখিতেছ যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশের ফলে জগতের সমুদয় কর্ত্তব্যগুলিই পবিত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। জগতের এমন কোন কর্ত্তব্য নাই, যাহাকে আমাদের 'ছোট কাজ' বলিয়া ঘৃণা করিবার অধিকার আছে। সুতরাং সিংহাসনোপবিষ্ট

রাজাধিরাজের রাজ্যশাসনরূপ কর্ত্তব্যের সহিত সাধারণ ব্যক্তির অন্যান্য কর্ত্তব্যের কোন প্রভেদ নাই।

এক্ষণে তোমরা বুদ্ধদেবের উপদেশ—তিনি জগতে যে মহতী বার্ত্তা ঘোষণা করিতে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অবহিত হও। তাঁহার বাণীও আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিয়া থাকে। বুদ্ধ বলিতেছেন,—স্বার্থপরতা এবং যাহা কিছু তোমাকে স্বার্থপর করিয়া ফেলে, তাহাদিগকে একেবারে উন্মূলিত কর। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া গৃহী বা সংসারী হইও না, সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য হও। সংসারী লোক মনে করে, আমি নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু যখনই সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়, অমনি সে স্বার্থপর হইয়া পড়ে। মা মনে করেন, আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইব, কিন্তু শিশুর মুখের দিকে তাকাইলেই অমনি তাঁহার স্বার্থপরতা আসিয়া পড়ে। এই জগতের সকল বিষয় সম্বন্ধেই এইরূপ। যখনই হৃদয়ে স্বার্থপর বাসনার উদয় হয়—যখনই লোকে কোন স্বার্থপর কার্য্য করে, তখনই তাহার মনুষ্যত্ব—যাহা লইয়া সে মানুষ—সেটি সব চলিয়া যায়, সে তখন পশুতুল্য হইয়া যায়, দাসবৎ হইয়া যায়, সে নিজ প্রতিবেশিগণকে, তাহার ভ্রাতৃস্বরূপ অন্যান্য মানবগণকে ভুলিয়া যায়। তখন সে আর বলে না,—'আগে তোমাদের হউক, আমার পরে হইবে,' কিন্তু বলে,—'আগে আমার হউক, তার পর বাকি সকলে নিজে নিজে দেখিয়া লইবে।'

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের জন্য আমাদের হৃদয়ের একদেশ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। আমরা তদীয় উপদেশ হৃদয়ে ধারণ না করিলে, কখন শান্ত ও অকপট ভাবে এবং

সানন্দে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।

সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥—গীতা,১৮,৪৮।

ভাবার্থ—'যে কর্ম্ম তোমায় করিতে হইতেছে, তাহার মধ্যে যদি কোন দোষ থাকে, তথাপি ভয় পাইও না; কারণ, এমন কোন কার্য্যই নাই যাহাতে কিছু না কিছু দোষ নাই।'

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।—গীতা, ৫,১০।

ভাবার্থ—সমুদয় কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর, আর উহার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না।

অপর দিকে আবার ভগবান বুদ্ধদেবের অমৃতময়ী বাণী আসিয়া আমাদের হৃদয়ের একদেশ অধিকার করিতেছে। সেই বাণী বলিতেছে,—সময় চলিয়া যাইতেছে, এই জগৎ ক্ষণস্থায়ী ও দুঃখপূর্ণ। হে মোহনিদ্রাভিভূত নরনারীগণ, তোমরা পরম মনোহর হর্ম্ম্যতলে বসিয়া বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম উপাদেয় চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছ—এদিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদের কথা কি কখনও ভ্রমেও তোমাদের মানসপটে উদিত হয়? ভাবিয়া দেখ, জগতের মধ্যে মহাসত্য এই—সর্ব্বং দুঃখমনিত্যমধ্রুবং—দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ—সমগ্র জগৎ দুঃখপূর্ণ। শিশু যখন মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াই কাঁদিয়া থাকে। শিশুর ক্রন্দন—ইহাই মহাসত্য ঘটনা। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ জগৎ কাঁদিবারই স্থান। সুতরাং

আমরা যদি ভগবান বুদ্ধদেবের বাক্যকে হৃদয়ে স্থান দিই, তবে আমরা যেন কখনও স্বার্থপর না হই।

আবার, সেই ঈশদূত ন্যাজারেথবাসী ঈশার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার উপদেশ এই:—"প্রস্তুত হও, কারণ, স্বর্গরাজ্য অতি নিকটবর্ত্তী।" আমি শ্রীকৃষ্ণের বাণী মনে মনে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কখনও কখনও তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া গিয়া সংসারে আসক্ত হইয়া পড়ি। আমি হঠাৎ ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাণী হৃদয়ের ভিতর শুনিতে পাই,—'সাবধান, জগতের সমুদয় পদার্থই ক্ষণস্থায়ী—এ জীবন সদাই দুঃখময়।' ঐ বাণী শুনিবামাত্র কাহার কথা শুনিব—শ্রীকৃষ্ণের কথা বা শ্রীবুদ্ধের কথা—এই বিষয়ে মন সংশয়দোলায় দুলিতে থাকে। তখনই অমনি বজ্রবেগে ভগবান ঈশার বাণী আসিয়া উপস্থিত হয়—"প্রস্তুত হও, কারণ, স্বর্গরাজ্য অতি নিকট।" এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না, কল্য হইবে বলিয়া কিছু ফেলিয়া রাখিও না। সেই চরম অবস্থার জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া থাক, উহা তোমার নিকট এখনই উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং ভগবান্ ঈশার উপদেশের জন্যও আমাদের হৃদয়ে স্থান রহিয়াছে—আমরা সাদরে তাঁহার ঐ উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি—আমরা এই ঈশদূতকে—সেই জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া থাকি।

তারপর আমাদের দৃষ্টি সেই মহাপুরুষের দিকে নিপতিত হয়, যিনি জগতে সাম্যভাবের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন—আমরা মহম্মদের কথা বলিতেছি। তোমরা জিজ্ঞসা করিতে পার,—'মহম্মদের ধর্ম্মের আবার ভাল কি থাকিতে পারে?' তাঁহার ধর্ম্মে

নিশ্চিত কিছু ভাল আছে—যদি না থাকিত, তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে কিরূপে? যাহা ভাল, তাহাই কেবল বাঁচিয়া থাকে, অন্য সমুদয়ের বিনাশ হইলেও উহার বিনাশ হয় না। যাহা কিছু ভাল, তাহাই সবল ও দৃঢ়, সুতরাং তাহাই বাঁচিয়া থাকে। অপবিত্র ব্যক্তির ইহকালে পরমায়ু কতদিন? পবিত্রচিত্ত সাধুর জীবন কি তদপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী নহে? নিশ্চিত; কারণ, পবিত্রতাই বল, সাধুতাই বল। সুতরাং মহম্মদীয় ধর্ম্মে যদি কিছুই ভাল না থাকিত, তবে উহা এতদিন বাঁচিয়া থাকিত কিরূপে? মুসলমানধর্ম্মে যথেষ্ট ভাল জিনিস আছে। মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য্য—তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব, সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, প্রফেট।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, জগতের প্রত্যেক অবতার, প্রত্যেক প্রফেট, প্রত্যেক ঈশদূতই জগতে বিশেষ বিশেষ সত্যের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন। ঐ ঐ বিশেষ বিশেষ সত্য যদি তোমরা পূর্ব্বে জানিয়া পরে ঐ সত্যবিশেষের প্রচারক আচার্য্যের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে ঐ সত্যের আলোকে তাঁহার সমগ্র জীবনটি ব্যাখ্যাত হইতেছে। অজ্ঞ মূর্খেরা নানাবিধ মত মতান্তর কল্পনা করিয়া থাকে, আর আপনাদের মানসিক উন্নতির অনুযায়ী আপনাদের ভাবানুযায়ী ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া, এই সকল মহাপুরুষে তাহা আরোপ করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহাদের উপদেশসমূহ লইয়া নিজেদের মতানুযায়ী ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মহান্ আচার্য্যের নিজ নিজ জীবনই তাঁহার উপদেশের একমাত্র ভাষ্য। তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিয়া

দেখ, তিনি নিজে যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপদেশের সহিত ঠিক মিলিবে। গীতা পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে, গীতার উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সহিত গীতার উপদেশের কি সুন্দর সমন্বয় রহিয়াছে।

মহম্মদ নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গেলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃভাব থাকা উচিত। উহার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, মতামত, বর্ণ বা লিঙ্গভেদ কিছু থাকিবে না। তুরস্কের সুলতান আফ্রিকার বাজার হইতে একজন নিগ্রোকে কিনিয়া, তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তুরস্কে আনিতে পারেন, কিন্তু সে যদি মুসলমান হয়, আর যদি তাহার উপযুক্ত গুণ থাকে, তবে সে, এমন কি, সুলতানের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। মুসলমানদের এই উদার ভাবের সহিত এদেশে (আমেরিকায়) নিগ্রো ও রেড্ইণ্ডিয়ান্দের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয়, তুলনা করিয়া দেখ। আর হিন্দুরা কি করিয়া থাকে? যদি তোমাদের একজন মিশনরি হঠাৎ একজন গোঁড়া হিন্দুর খাদ্য ছুঁইয়া ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ উহা ফেলিয়া দিবে। আমাদের এত বড় উচ্চ দর্শন সত্ত্বেও আমরা কার্য্যের সময়, আচরণের সময়, কিরূপ দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া থাকি, লক্ষ্য করিও। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর তুলনায় এইখানে মুসলমানদের মহত্ত্ব—জাতি বা বর্ণ বিচার না করিয়া সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন।

পূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষ ও অবতারগণের বিষয় কথিত হইল, তাঁহারা ছাড়া অন্য ও শ্রেষ্ঠ অবতার কি জগতে আসিবেন? অবশ্যই আসিবেন। কিন্তু তাঁহারা আসিবেন বলিয়া বসিয়া থাকিও না।

আমি বরং চাই, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই যথার্থ নবসংহিতার আচার্য্যস্বরূপ, অবতারস্বরূপ হও—যাহা সমুদয় প্রাচীন সংহিতার সমষ্টিস্বরূপ। প্রাচীনকালে বিভিন্ন অবতারগণ যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সমুদয়গুলিকেই গ্রহণ কর, নিজ নিজ অপরোক্ষানুভূতি উহার সহিত মিলিত করিয়া সম্পূর্ণ কর এবং ঐ উপদেশ-সমষ্টি লইয়া তুমি অপরের নিকট প্রফেটস্বরূপ—অবতারস্বরূপ হইয়া তাহার নিকট সত্য ঘোষণা কর। পূর্ব্ববর্ত্তী সকল আচার্য্যই মহান্ ছিলেন, প্রত্যেকেই আমাদের জন্য কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পক্ষে ঈশ্বরস্বরূপ। আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করি—আমরা তাঁহাদের দাস। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদেরও নমস্কার করিব; কারণ, তাঁহারা যেমন প্রফেট, ঈশ্বরতনয় বা অবতার, আমরাও তাহাই। তাঁহারা পূর্ণতালাভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধ হইয়াছিলেন, আমরাও এখনই, ইহ-জীবনেই, সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইব। যীশুখ্রীষ্টের সেই বাণী স্মরণ রাখিও—"স্বর্গরাজ্য অতি নিকটবর্ত্তী।" এখনই, এই মুহূর্ত্তেই, এস, আমরা প্রত্যেকে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি,—'আমি প্রফেট হইব, আমি সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানের বার্ত্তাবহ হইব, আমি ঈশ্বরতনয়—শুধু তাহাই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ হইব।

ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট

(১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলিসে প্রদত্ত বক্তৃতা)

সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল, আবার উহা পড়িয়া গেল। আবার আর এক তরঙ্গ উঠিল—হয় ত উহা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর—আবার উহার পতন হইল—আবার এইরূপে উঠিল। এইরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও আমরা এইরূপ উত্থান পতন দেখিয়া থাকি, আর সাধারণতঃ আমরা উত্থানটার দিকেই দৃষ্টি করি—পতনটার দিকে সচরাচর আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু সংসারে এই উভয়েরই সার্থকতা আছে—উভয়ের কোনটিরই মূল্য কম নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রীতিই এই। কি চিন্তাজগতে, কি আমাদের পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—সর্ব্বত্রই এই ক্রমগতি—সর্ব্বত্রই উত্থানপতন চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উচ্চতম ব্যাপারগুলি—উদার আদর্শসমূহ সময়ে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আবার উহা ডুবিয়া যায়, লোকচক্ষুর সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়—যেন ঐ অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য, উহাদিগকে রোমন্থন করিবার জন্য উহা কিছুকালের মত অদৃশ্য হয়, যেন ঐ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ খাওয়াইবার জন্য, উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্য, পুনরায় উঠিবার—

পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে উঠিবার নিমিত্ত বলসঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল উহা বিলুপ্তপ্রায় বোধ হয়।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলেও চিরকালই এইরূপ উত্থানপতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যে মহাত্মার—যে ঈশ্বরাদেশ-বাহকের জীবনচরিত আমরা অদ্য অপরাহ্ণে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনিও স্বজাতির ইতিহাসের এমন এক যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাহাকে আমরা নিশ্চিতই মহাপতনের যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। তাঁহার উপদেশ ও কার্য্যকলাপের যে বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে ইহার অল্পমাত্র আভাস প্রাপ্ত হই। বিক্ষিপ্ত সামান্য বিবরণ বলিলাম—কারণ, তাঁহার সম্বন্ধে কথিত এই বাক্য সম্পূর্ণ সত্য যে, তাঁহার সমুদয় উক্তি ও কার্য্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে সমগ্র জগৎ তাঁহাতে পূর্ণ হইয়া যাইত। আর তাঁহার তিন-বর্ষব্যাপী ধর্ম্মপ্রচারকালের মধ্যে যেন কত যুগের ঘটনা, কত যুগের ব্যাপার একত্র সঙ্ঘটিত হইয়াছে—সেগুলিকে প্রকাশ করিতে এই ঊনবিংশতি শতাব্দী লাগিয়াছে, আর কে জানে, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইতে আর কতদিন লাগিবে? আপনার আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ অতি ক্ষুদ্র শক্তির আধার মাত্র। কয়েক মুহূর্ত্ত, কয়েক ঘণ্টা, বড় জোর কয়েক বর্ষ আমাদের সমুদয় শক্তি বিকাশের পক্ষে—উহার সম্পূর্ণ প্রসারের পক্ষে—পর্য্যাপ্ত। তার পর আর আমাদের কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাশক্তিধর পুরুষের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। শত শত শতাব্দী, শত শত যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি জগতে যে শক্তিসঞ্চার করিয়া গেলেন,

এখনও তাহার প্রসারকার্য্যের বিরাম নাই, এখনও উহা পূর্ণভাবে ব্যয়িত হয় নাই। যতই যুগের পর যুগপ্রবাহ চলিয়াছে, ততই উহাও নব বলে বলীয়ান্ হইতেছে।

এক্ষণে দেখুন, যীশুখ্রীষ্টের জীবনে যাহা দেখিতে পান, তাহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় প্রাচীন ভাবের সমষ্টিস্বরূপ। ধরিতে গেলে একভাবে সকল ব্যক্তির জীবন, সকল ব্যক্তির চরিত্রই অতীত ভাব-সমূহের ফলস্বরূপ। সমগ্র জাতীয় জীবনের এই অতীত ভাবসমূহ—বংশানুক্রমিক সঞ্চরণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ, শিক্ষা এবং নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর আসিয়া থাকে। সুতরাং একভাবে প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরই সমগ্র পৃথিবীর, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় অতীত সম্পত্তি রহিয়াছে বলিতে হইবে। আমরা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যেরূপ, তাহা সেই অনন্ত অতীতের হস্তনির্ম্মিত কার্য্যস্বরূপ, ফলস্বরূপ বই আর কি? আমরা অনন্ত ঘটনা প্রবাহে অনিবার্য্যরূপে পুরোভাগে অগ্রসর ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে অসমর্থ ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গনিচয় ব্যতীত আর কি? প্রভেদ এই—আপনি আমি অতি ক্ষুদ্র বুদ্বুদস্বরূপ মাত্র। কিন্তু জাগতিক ঘটনানিচয়রূপ মহাসমুদ্রে কতকগুলি প্রবল তরঙ্গ থাকেই। আপনাতে আমাতে জাতীয় জীবনের অতীত ভাব অতি অল্পমাত্রই পরিস্ফুট হইয়াছে; কিন্তু এমন অনেক শক্তিমান্ পুরুষও আছেন, যাঁহারা যেন প্রায় সমগ্র অতীতের সাকার বিগ্রহস্বরূপ ও ভবিষ্যতের দিকেও সদা প্রসারিত কর। সমগ্র মানবজাতি যে অনন্ত উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ইঁহারা যেন সেই পথের পথনির্দ্দেশক স্তম্ভস্বরূপ। বাস্তবিক ইঁহারা এত বড় যে ইঁহাদের ছায়ায় যেন

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ঢাকিয়া ফেলে, আর ইঁহারা অনাদি অনন্তকাল অবিনাশিভাবে দণ্ডায়মান থাকেন। এই মহাপুরুষ যে বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তি ঈশ্বরতনয়ের ভিতর দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কখন দর্শন করে নাই," এ কথা অতি সত্য। ঈশ্বরতনয়ে ব্যতীত ঈশ্বরকে আমরা আর কোথায় দেখিব? ইহা খুব সত্য যে, আপনাতে আমাতে, আমাদের মধ্যে অতি দীন হীন ব্যক্তিতে পর্য্যন্ত ঈশ্বর বিদ্যমান, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব আমাদের সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন আলোকের পরমাণুসকল সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বত্র স্পন্দনশীল হইলেও উহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিপথে আনিতে হইলে প্রদীপ জ্বালিবার প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সেই সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর—জগতের সুমহান্ দীপাবলিস্বরূপ এই সকল প্রত্যাদিষ্ট পুরুষে, এই সকল নরদেবে, ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপ এই সকল অবতারে প্রতিবিম্বিত না হইলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না।

আমরা সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, আমরা তাঁহার ভাব ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু এই সকল মহান্ জ্ঞানজ্যোতিঃসম্পন্ন ভগবানের অগ্রদূতগণের কোন একজনের চরিত্রের সহিত আপনার ঈশ্বরসম্বন্ধীয় উচ্চতম ধারণার তুলনা করুন দেখি। দেখিবেন, আপনার কল্পিত ঈশ্বর প্রত্যক্ষ জীবন্ত আদর্শ পুরুষ হইতে অনেকাংশে হীনতর, অবতারের, ঈশ্বরাদিষ্ট পুরুষের চরিত্র আপনার ধারণা হইতে বহু বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আদর্শের সাকারবিগ্রহস্বরূপ এই সকল পুরুষ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের মহজ্জীবনের যে দৃষ্টান্ত আমাদের

সমক্ষে ধরিয়াছেন, আপনারা তাহা হইতে ঈশ্বরের উচ্চতর ধারণা করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এই সকল পুরুষকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করা কি অন্যায় কার্য্য? এই নরদেবগণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগকে জগতের মধ্যে ঈশ্বরের একমাত্র সাকারবিগ্রহস্বরূপে উপাসনা করা কি পাপ? যদি তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের সর্ব্ববিধ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা বা কল্পনা হইতে উচ্চতর হন, তবে তাঁহাদিগকে উপাসনা করিতে দোষ কি? ইহাতে যে শুধু দোষ নাই, তাহা নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের উপাসনা কেবল এই ভাবেই সম্ভবপর হইতে পারে। আপনারা যতই চেষ্টা করুন না—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করুন বা স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর বিষয়ে মন দিয়াই চেষ্টা করুন, যতদিন আপনারা মানবজগতের মধ্যে নরদেহে অবস্থিত, ততদিন আপনাদের উপলব্ধ সমগ্র জগৎই নরভাবাপন্ন আপনাদের ধর্ম্মও মানবভাবে ভাবিত, আপনাদের ঈশ্বরও নরভাবাপন্ন। এরূপ না হইয়াই যাইতে পারে না। কে এমন বাতুল আছে যে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ উপলব্ধ বস্তুকে গ্রহণ করিয়া এমন বস্তুকে ত্যাগ না করিবে, যাহা কেবল কল্পনাগ্রাহ্য ভাববিশেষ মাত্র, যাহাকে সে ধরিতে ছুঁইতে পারে না এবং স্থূল অবলম্বনের সহায়তা ব্যতীত যাহার নিকট অগ্রসর হওয়াই দুরূহ? সেই কারণে এই সকল ঈশ্বরাবতার সকল যুগে, সকল দেশেই পূজিত হইয়াছেন।

আমরা এক্ষণে য়াহুদীদিগের অবতার খ্রীষ্টের জীবনচরিতের একটু আধটু আলোচনা করিব। আমি পূর্ব্বে, একটি তরঙ্গের উত্থানের পর ও দ্বিতীয় তরঙ্গ উত্থানের পূর্ব্বে তরঙ্গের যে পতনা-

বস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, খ্রীষ্টের জন্মকালে য়াহুদীদের সেই অবস্থা ছিল। উহাকে রক্ষণশীলতা অবস্থা বলিতে পারা যায়—ঐ অবস্থায় মানবাত্মা যেন চলিতে চলিতে কিছুকালের জন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে—সে এতদিন ধরিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিতেই যেন ব্যগ্র! এ অবস্থায় জীবনের সার্ব্বভৌমিক ও মহান্ সমস্যাসমূহের দিকে মন না গিয়া খুঁটিনাটির দিকেই মনোযোগ অধিক থাকে; ঐ অবস্থায় যেন তরণী অগ্রসর না হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকে—উহাতে ক্রিয়াশীলতা অপেক্ষা অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হউক—এই ভাবে সহ্য করিয়া যাওয়ার ভাবই অধিক বিদ্যমান। এটি লক্ষ্য করিবেন, আমি এই অবস্থার নিন্দা করিতেছি না, আমাদের উহার উপর দোষারোপ করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কারণ, যদি এই পতনাবস্থা না ঘটিত, তবে ন্যাজারেথবাসী যীশুতে যে পরবর্ত্তী উত্থান সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল তাহা অসম্ভব হইত। ফারিসি ও সাদ্দিউসিগণ * হয়ত কপট ছিলেন, তাঁহারা এমন সকল বিষয় হয়ত করিতেন, যাহা তাঁহাদের করা উচিত ছিল না, হইতে পারে তাঁহারা ঘোর ধর্ম্মধ্বজী ও ভণ্ড ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা যেরূপই থাকুন না কেন যীশুখ্রীষ্টরূপ কার্য্য বা ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে তাঁহারাই বীজ বা কারণস্বরূপ। যে শক্তিবেগ একদিকে ফারিসি ও সাদ্দিউসিরূপে অভ্যুদিত

* Pharisee—যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক য়াহুদীদের এক ধর্ম্মসম্প্রদায়—ইহারা ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অপেক্ষা বাহ্যবিধি অনুষ্ঠানাদি পালনেই অধিক আগ্রহ দেখাইতেন। Sadducee—ঐ সময়ের এক য়াহুদী সম্প্রদায়—ইহারা অভিজাত বংশীয় ও সন্দেহবাদী ছিলেন।

হইয়াছিল, তাহাই অপরদিকে মহামনীষী ন্যাজারেথবাসী যীশুরূপে আবির্ভূত হন।

অনেক সময় আমরা বাহ্য ক্রিয়াকলাপাদির উপর—ধর্ম্মের অত খুঁটিনাটির উপর নজরকে হাসিয়া উড়াইয়া দিই বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যেই ধর্ম্মজীবনের শক্তি অন্তর্নিহিত। অনেক সময় আমরা অত্যগ্রসর হইতে যাইয়া ধর্ম্মজীবনের শক্তি হারাইয়া ফেলি। দেখাও যায় সাধারণতঃ উদার পুরুষগণ অপেক্ষা গোঁড়াদের মনের তেজ বেশী। সুতরাং গোঁড়াদের ভিতরও একটা মহৎ গুণ আছে —তাহাদের ভিতর যেন প্রবল শক্তিরাশি সংগৃহীত ও সঞ্চিত থাকে। ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধে যেমন সমগ্র জাতিসম্বন্ধেও তদ্রূপ— জাতির ভিতরেও ঐরূপ শক্তি সংগৃহীত হইয়া সঞ্চিত থাকে। চতুর্দ্দিকে বাহ্য শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া—রোমকদিগের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এক কেন্দ্রে সন্নিবদ্ধ, এবং চিন্তাজগতে গ্রীক্ ভাব-সমূহের দ্বারা এবং পারস্য, ভারত ও আলেকজান্দ্রিয়া হইতে আগত ভাব-তরঙ্গরাজির দ্বারা এক নির্দ্দিষ্টগণ্ডিতে, এক নির্দ্দিষ্টকেন্দ্রে বিতাড়িত হইয়া—এইরূপে চতুর্দ্দিকে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক— সর্ব্ববিধশক্তি সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই য়াহুদীজাতি স্বাভাবিক প্রবল স্থিতিশীল শক্তিতে দণ্ডায়মান ছিল। ইহাদের বংশধর-গণ আজও এই শক্তি হারায় নাই। আর উক্ত জাতি তাহার সমগ্র-শক্তি জেরুজেলেম ও য়াহুদীয় ধর্ম্মের উপর কেন্দ্রীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আর সকল শক্তিই একবার সঞ্চিত হইলে যেমন অধিক-ক্ষণ একস্থানে থাকিতে পারে না—উহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া আপনাকে নিঃশেষ করে, ইহার সম্বন্ধেও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল।

পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই, যাহাকে দীর্ঘকাল সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। সুদূর-ভবিষ্যৎযুগে প্রসারিত হইবে বলিয়া উহাকে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া একস্থানে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না। য়াহুদী জাতির অভ্যন্তরে অবস্থিত এই সমষ্টিভূত শক্তি পরবর্ত্তী যুগে খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত আসিয়া মিলিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সৃজন করিল। এইরূপে ক্রমশঃ বহু ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর সম্মিলনে বিপুলকায়া তরঙ্গশালিনী মহানদীর উৎপত্তি। ইহার প্রবল তরঙ্গের শুভ্র শীর্ষদেশে ন্যাজারেথবাসী যীশু সমাসীন রহিয়াছেন। এইরূপে সকল মহাপুরুষই তাঁহাদের সম-সাময়িক অবস্থা-চক্রের ফলস্বরূপ; তাঁহাদের নিজ জাতি অতীতের ফলস্বরূপ; তাঁহারা আবার স্বয়ং ভবিষ্যৎযুগের স্রষ্টা। অতীত কারণ-সমষ্টির ফলস্বরূপ কার্য্যাবলি আবার ভাবী কার্য্যের কারণস্বরূপ হয়। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষসম্বন্ধেও একথা খাটে। তাঁহার নিজ জাতির মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম, ঐ জাতি যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য শত শত যুগ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহাই তাঁহাতে সাকার বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিল। আর তিনি স্বয়ং ভবিষ্যতের পক্ষে মহাশক্তির আধার স্বরূপ—শুধু তাঁহার নিজ জাতির পক্ষে নহে, জগতের অন্যান্য অসংখ্য জাতির পক্ষেও তাঁহার জীবনের প্রেরণা মহাশক্তির বিকাশ করিয়াছে।

আর একটি বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে যে, ঐ ন্যাজারেথবাসী মহাপুরুষের বর্ণনা আমি প্রাচ্যদেশীয়গণের দৃষ্টি হইতে করিব। আপনারা ইহা অনেক সময়েই ভুলিয়া যান যে, তিনি

স্বয়ং একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন। তাঁহাকে আপনারা নীলনয়ন ও পীতকেশরূপে অঙ্কন ও বর্ণনার যতই চেষ্টা করুন না, তথাপি তিনি যে একজন প্রাচ্যদেশীয় ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাইবেলগ্রন্থে যে সকল উপমা ও রূপকের প্রয়োগ আছে, উহাতে যে সকল দৃশ্য ও স্থানের বর্ণনা আছে, উহার কবিত্ব, উহাতে অঙ্কিত চিত্রসমূহের ভাবভঙ্গী ও সন্নিবেশ এবং উহাতে বর্ণিত প্রতীক ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি—এই সমুদয়ই প্রাচ্যভাবেরই সাক্ষ্য দিতেছে। উহাতে উজ্জ্বল আকাশ, উত্তাপ, প্রখর রবি এবং তৃষ্ণার্ত্ত নরনারী ও জীবকুলের বর্ণনা—মেষপাল, কৃষককুল ও কৃষিকার্য্যের বর্ণনা—পনচাক্কি, ঘটীযন্ত্র, পনচাক্কিসংলগ্ন সরোবর ও ঘরট্টের (পিষিবার জাঁতা) বর্ণনা—এই সকলগুলিই এখনও এসিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এসিয়া চিরদিনই জগৎকে ধর্ম্মের বাণী শুনাইয়াছে—ইউরোপ চিরদিনই রাজনীতির বাণী ঘোষণা করিয়াছে। নিজ নিজ কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। ইউরোপের ঐ বাণী আবার প্রাচীন গ্রীসের প্রতিধ্বনিমাত্র। নিজ সমাজই গ্রীকদের সর্ব্বস্ব ছিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকল সমাজই তাহাদের চক্ষে বর্ব্বর—তাহাদের মতে গ্রীক ব্যতীত আর কাহারও জগতে থাকিবার অধিকার নাই। তাহাদের মতে গ্রীকেরা যাহা করে তাহাই ঠিক; জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহার কোনটিই ঠিক নহে, সুতরাং তাহাকে জগতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহাদের সহানুভূতি মানবজাতিতেই একান্ত সীমাবদ্ধ, সুতরাং উহা একান্ত স্বাভাবিক, আর সেই কারণেই গ্রীক সভ্যতা নানারূপ

কলাকৌশলময়। গ্রীক মন সম্পূর্ণরূপে ইহলোক লইয়াই ব্যাপৃত; সে এই জগতের বাহিরের কোন বিষয় স্বপ্নেও ভাবিতে চায় না। এমন কি, উহাদের কবিতা পর্য্যন্ত এই ব্যবহারিক জগৎকে লইয়া। উহাদের দেবদেবী সকলের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, তাঁহারা মানুষ, সম্পূর্ণরূপে মানব-প্রকৃতিবিশিষ্ট, সাধারণ মানব যেমন সুখে দুঃখে হৃদয়ের নানা আবেগে উত্তেজিত হইয়া পড়েন, ইঁহারাও প্রায় তদ্রূপ। ইহারা সৌন্দর্য্য ভালবাসে বটে, কিন্তু এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, উহা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছুই নহে—যেমন শৈলরাশি, হিমানী ও কুসুমরাশির সৌন্দর্য্য—বাহ্য অবয়ব ও আকৃতির সৌন্দর্য্য—নরনারীর মুখের, বিশেষতঃ আকৃতির সৌন্দর্য্যেই গ্রীকেরা আকৃষ্ট হইত। আর এই গ্রীকগণই পরবর্ত্তী যুগের ইউরোপের শিক্ষাগুরু বলিয়া ইউরোপ গ্রীসের বাণীরই প্রতিধ্বনি করিতেছে।

এশিয়ায় আবার অন্তঃপ্রকৃতি লোকের আবাস। উক্ত প্রকাণ্ড মহাদেশের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখুন—কোথাও শৈলমালার চূড়াগুলি অভ্র ভেদ করিয়া নীল গগনচন্দ্রাতপকে যেন প্রায় স্পর্শ করিতেছে; কোথাও প্রকাণ্ড মরুভূমিসমূহ ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে—যেখানে একবিন্দু জল পাইবার সম্ভাবনা নাই; একটি তৃণও যথায় উৎপন্ন হয় না; কোথাও নিবিড় অরণ্যানী বিরাজমান—উহাও ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া চলিয়াছে—যেন ফুরাইবার নাম নাই! আবার কোথাও বা বিপুলকায়া স্রোতস্বতী-সমূহ প্রবলবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির এই সকল মহিমময় দৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচ্যদেশবাসীর সৌন্দর্য্য

ও গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভালবাসা এক সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বিকাশ প্রাপ্ত হইল। উহা বহির্দ্দৃষ্টি ত্যাগ করিয়া অন্তর্দ্দৃষ্টিপরায়ণ হইল। তথায়ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসম্ভোগের অদম্য তৃষ্ণা, প্রকৃতির উপর আধিপত্যের তীব্র পিপাসা বিদ্যমান—তথায়ও উন্নতির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান—গ্রীকেরা যেমন অপরজাতিসমূহকে বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিত, তথায়ও সেই ভেদবুদ্ধি, সেই ঘৃণার ভাব বিদ্যমান। কিন্তু তথায় জাতীয় ভাবের পরিধি অধিকতর বিস্তৃত। এসিয়ায় আজও জন্ম, বর্ণ বা ভাষা লইয়া জাতি সংগঠিত হয় না। তথায় একধর্ম্মাবলম্বী হইলেই এক জাতি হয়। সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় মুসলমান মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় বৌদ্ধ মিলিয়া এক জাতি, সমুদয় হিন্দু মিলিয়া এক জাতি। একজন বৌদ্ধ চীন দেশবাসী, এবং অপর একজন পারস্যদেশবাসীই হউক না কেন, যেহেতু উভয়ে একধর্ম্মাবলম্বী, সেই হেতু তাহারা পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া মনে করিয়া থাকে। তথায় ধর্ম্মই মানবজাতির পরস্পরের বন্ধনস্বরূপ, উহাই মানবের সম্মিলনভূমি। আর ঐ পূর্ব্বোক্ত কারণেই প্রাচ্যদেশীয়গণ পরোক্ষপ্রিয়—তাহারা জন্ম হইতেই বাস্তব জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্নজগতে থাকিতেই ভালবাসে। জলপ্রপাতের মধুর তরতর পতনশব্দ, বিহগকুলের কাকলী, সূর্য্য চন্দ্র, তারা, এমন কি সমগ্র জগতের সৌন্দর্য্য যে পরম মনোরম ও উপভোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচ্যমনের পক্ষে উহাই পর্য্যাপ্ত নহে—উহা অতীন্দ্রিয়রাজ্যের ভাবে ভাবুক হইতে চায়। সে বর্ত্তমানের—ইহজগতের—গণ্ডিভেদ করিয়া তাহার অতীতপ্রদেশে যাইতে চায়। বর্ত্তমান—প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার পক্ষে

যেন কিছুই নয়। প্রাচ্য ভূভাগ যুগযুগান্তর ধরিয়া সমগ্র মানবজাতির শৈশবশয্যাস্বরূপ রহিয়াছে—তথায় ভাগ্যচক্রের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় এক রাজ্যের পর অপর রাজ্যের অভ্যুদয়, এক সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়া অপর সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে, মানবীয় ঐশ্বর্য্যবৈভব, গৌরব, শক্তি—সবই এখানে গড়াগড়ি যাইতেছে—যেন বিদ্যা, ঐশ্বর্য্যবৈভব, সাম্রাজ্য—সমুদয়ের সমাধিভূমি—ইহাই প্রাচ্যভূমির পরিচয়। সুতরাং প্রাচ্যদেশীয়গণ যে এই জগতের সমুদয় পদার্থকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং স্বভাবতঃই এমন কিছু বস্তু দর্শন করিতে চান যাহা অপরিণামী, অবিনাশী, এবং এই দুঃখ ও মৃত্যুপূর্ণ জগতের মধ্যে নিত্য আনন্দময় ও অমর—ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। প্রাচ্যদেশীয় মহাপুরুষগণ এই আদর্শের বিষয় ঘোষণা করিতে কখন ক্লান্তিবোধ করেন না। আর জগতের সকল অবতার ও মহাপুরুষগণের উদ্ভবস্থানসম্বন্ধেও আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, ইঁহাদের সকলেই প্রাচ্যদেশীয়, কেহই অন্য দেশের লোক নহেন।

আমরা আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষের প্রথম মূলমন্ত্রই এই দেখিতে পাই যে, এ জীবন কিছুই নহে, ইহা হইতে উচ্চতর আরও কিছু আছে; আর তিনি ঐ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব জীবনে পরিণত করিয়া তিনি যে যথার্থ প্রাচ্য দেশের সন্তান, তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের লোক আপনাদের নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অর্থাৎ সামরিক ব্যাপারে, রাষ্ট্রনৈতিকবিভাগের পরিচালনে ও তথাবিধ অন্যান্য ব্যাপারে আপনাদের কৃতকর্ম্মতার পরিচয় দিয়াছেন। হয়ত প্রাচ্যদেশীয়গণ ওসকল বিষয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন

নাই, কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে সফল—তাঁহারা ধর্ম্মকে নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন—কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তিনি যদি কোন দর্শন প্রচার করেন, তবে দেখিবেন, কাল শত শত লোক আসিয়া প্রাণপণে নিজেদের জীবনে উহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রচার করেন, যে এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে তাহাতেই মুক্তি হইবে, তিনি তখনই এমন পাঁচ শত অনুবর্ত্তী পাইবেন, যাহারা এক পায়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে প্রস্তুত হইবে। আপনারা ইহাকে উপহাসাস্পদ কথা বলিতে পারেন, কিন্তু জানিবেন, ইহার পশ্চাতে তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র বিদ্যমান—তাহারা যে ধর্ম্মকে কেবল বিচারের বস্তু না ভাবিয়া উহাকে জীবনে উপলব্ধি করিবার—কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে তাহার আভাস ও পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে মুক্তির যে সকল বিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যায়াম মাত্র, উহাদিগকে কোনকালে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করা হয় না। পাশ্চাত্যদেশে যে প্রচারক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টারূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি প্রথমতঃ, এই ন্যাজারথবাসী যীশু প্রকৃতপক্ষেই প্রাচ্যদেশীয়দের ভাবে সম্পূর্ণ ভাবিত ছিলেন। তাঁহার এই নশ্বর জগৎ ও উহার নশ্বর ঐশ্বর্য্যে আদৌ আস্থা ছিল না। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য জগতে যেরূপ শাস্ত্রীয় বাক্যের টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহার (এত টানাটানি করা হয় যে, আর টানিয়া বাড়ান চলে না—শাস্ত্র বাক্যগুলি ত আর

ইণ্ডিয়া-রবার নহে যে, যত ইচ্ছা টানিয়া বাড়ান যাইবে, আর উহারও একটা সীমা আছে) কোন প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মকে বর্ত্তমান কালের ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্বতার সহায়কস্বরূপ করিয়া লওয়া কখনই উচিত নহে। এটি বেশ বুঝিবেন যে, আমাদিগকে সরল ও অকপট হইতে হইবে। যদি আমাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার শক্তি না থাকে, তবে আমরা যেন আমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া লই, কিন্তু আদর্শকে যেন কখন খাট না করি—কেহ যেন আদর্শটিকেই একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ খ্রীষ্টের জীবনের যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়া থাকেন, তাহা শুনিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসে। ইহাদের বর্ণনা হইতে তিনি যে কি ছিলেন, কি না ছিলেন, কিছুই বলিতে পারি না। কেহ কেহ তাঁহাকে একজন মহা রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে একজন সেনাপতি বলিয়া, অপর একজন স্বদেশহিতৈষী য়াহুদী, অপরে বা তাঁহাকে অনুরূপ একটা কিছু প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেল গ্রন্থে কি এমন কোন কথা আছে, যাহাতে আমাদের উক্তবিধ সিদ্ধান্তগুলির যাথার্থ্য ও ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে? একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যের জীবনের ও উপদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য তাঁহার নিজের জীবন। এক্ষণে যীশু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শুনুন। "শৃগালেরও একটা গর্ত্ত থাকে, আকাশচারী বিহঙ্গগণেরও নীড় আছে, কিন্তু মানবপুত্রের (যীশুর) মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থান নাই।" যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং এইরূপ ত্যাগী ও বৈরাগ্যবান ছিলেন, আর তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা এই যে, এই ত্যাগ বৈরাগ্যই মুক্তির

একমাত্র পথ—তিনি মুক্তির আর কোন পথ প্রদর্শন করেন নাই। আমরা যেন দন্তে তৃণ লইয়া বিনীতভাবে স্বীকার করি যে, আমাদের এইরূপ ত্যাগ-বৈরাগ্যের শক্তি নাই আমাদের এখনও 'আমি' ও 'আমার'—ইহাদের উপর ঘোর আসক্তি বর্ত্তমান। আমরা ধন ঐশ্বর্য্য বিষয়—এই সব চাই। আমাদিগকে ধিক্—আমরা যেন আমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করি, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে অন্যরূপে বর্ণনা করিয়া মানবজাতির এই মহান্ আচার্য্যকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার পারিবারিক বন্ধন কিছু ছিল না। আপনারা কি মনে করেন, এই ব্যক্তির ভিতর কোন সাংসারিক ভাব ছিল? আপনারা কি ভাবেন, জ্ঞানজ্যোতির পরম আধারস্বরূপ, এই অমানব স্বয়ং ঈশ্বর জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন পশুজাতির সমধর্ম্মী হইবার জন্য? তথাপি লোকে তাঁহার উপদেশ বলিয়া যা তা প্রচার করিয়া থাকে। তাঁহার স্ত্রীপুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল না—তিনি আপনাকে লিঙ্গোপাধিরহিত আত্মা বলিয়া জানিতেন। তিনি জানিতেন, তিনি শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ—কেবল দেহে অবস্থিত হইয়া মানবজাতির কল্যাণের জন্য দেহকে পরিচালন করিতেছেন মাত্র—দেহের সঙ্গে তাঁহার শুধু ঐটুকুমাত্র সম্পর্ক ছিল। আত্মাতে কোন-রূপ লিঙ্গভেদ নাই। বিদেহ আত্মার পাশব ভাবের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই—দেহের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অবশ্য এইরূপ ত্যাগের ভাব হইতে আমরা এখন বহুদূরে অবস্থিত হইতে পারি, হইলামই বা—কিন্তু আমাদের আদর্শটিকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমরা যেন স্পষ্ট স্বীকার করি যে,

ত্যাগই আমাদের আদর্শ, কিন্তু আমরা ঐ আদর্শের নিকট পঁহুছিতে এখনও অক্ষম।

তিনি যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ—এই তত্ত্ব উপলব্ধি ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন কার্য্য ছিল না, আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি বাস্তবিকই বিদেহ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মাস্বরূপ ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার অদ্ভুত দিব্যদৃষ্টিসহায়ে ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক নরনারী, সে য়াহুদীই হউক বা অন্য জাতিই হউক, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু—সকলেই তাঁহারই ন্যায় সেই এক অবিনাশী আত্মাস্বরূপ বই আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার সমগ্র জীবনে এই একমাত্র কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে তাহাদের আপন আপন যথার্থ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "তোমরা দীনহীন, এই কুসংস্কারময় স্বপ্ন ছাড়িয়া দাও। মনে করিও না যে, অপরে তোমাদিগকে দাসবৎ পদদলিত এবং উৎপীড়িত করিতেছে, কারণ তোমাদের মধ্যে এমন এক বস্তু রহিয়াছে যাহার উপর কোন অত্যাচার করা চলে না, যাহাকে পদদলিত করা যায় না, যাহাকে কোন মতে বিনাশ করিতে বা কোনরূপ কষ্ট দিতে পারা যায় না।" আপনারা সকলেই ঈশ্বরতনয়, সকলেই অমর আত্মাস্বরূপ। তিনি এই মহাবাণী জগতে ঘোষণা করিয়াছেন —"জানিও, স্বর্গরাজ্য তোমার অভ্যন্তরেই অবস্থিত।"—"আমি ও আমার পিতা অভেদ।" ন্যাজারেথবাসী যীশু এই সব কথাই বলিয়াছেন। তিনি এই সংসারের কথা বা এই দেহের বিষয় কখনও বলেন নাই। জগতের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই ছিল

না—এইটুকু মাত্র সম্পর্ক ছিল যে, উহাকে ধরিয়া তিনি সম্মুখে খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিবেন—আর ক্রমাগত উহাকে অগ্রসর করিতে থাকিবেন, যতদিন না সমগ্র জগৎ সেই পরম জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের নিকট পঁহুছিতেছে, যতদিন না প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে, যতদিন না দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত হইতেছে।

তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী আখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পাঠ করিয়াছি। খ্রীষ্টের জীবনচরিতের সমালোচক পণ্ডিতবর্গ ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলি এবং "উচ্চতর সমালোচনা"* নামধেয় সাহিত্যরাশির সহিতও আমরা পরিচিত। আর নানাগ্রন্থ আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতেরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও আমরা জানি। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশ কতটা সত্য অথবা উহাতে বর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিত কতটা ঐতিহাসিক সত্যের সহিত মিলে, এ সকল বিষয় বিচারার্থ অদ্য আমরা এখানে সমাগত হই নাই। যীশুখ্রীষ্টের জন্মিবার পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে নিউ টেষ্টামেণ্ট লিখিত হইয়াছিল কি না, অথবা যীশুখ্রীষ্টের জীবনচরিতের কতটা অংশ সত্য, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ঐ সকল লেখার

---

* Higher বা Historical Criticism :—ইতিহাস ও সাহিত্যের দিক হইতে বাইবেলগ্রন্থের বিভিন্নাংশের রচনা, রচনাকাল ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিচারসম্বলিত সাহিত্যরাশি উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহা Textual or Verbal Criticism—অর্থাৎ বাইবেলের শ্লোকাবলি ও শব্দরাশি সম্বন্ধীয় বিচার হইতে পৃথক্ ও উচ্চতর বলিয়া Higher Criticism নামে অভিহিত।

পশ্চাতে এমন কিছু আছে যাহা অবশ্য সত্য, এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের অনুকরণের যোগ্য। মিথ্যা কথা বলিতে হইলে সত্যেরই নকল করিতে হয় এবং ঐ সত্যটির বাস্তবিকই সত্তা আছে। যাহার বাস্তবিক সত্তা কোন কালে ছিল না, তাহার নকল করা চলে না। যাহা আপনারা কোন কালে কখনও উপলব্ধি করেন নাই, তাহার কখনই অনুকরণ করিতে পারেন না। সুতরাং ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জিত স্বীকার করিলেও, ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ কল্পনারও অবশ্যই কিছু ভিত্তি ছিল,—নিশ্চিত সেই সময়ে জগতে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল—আধ্যাত্মিক শক্তির এক অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল—এবং সেই মহা আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেই অদ্য আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ঐ মহাশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই, তখন আমাদের পণ্ডিতকুলের সমালোচনায় ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। যদি প্রাচ্যদেশীয়দের ন্যায় আমাকে এই ন্যাজারেথবাসী যীশুর উপাসনা করিতে হয়, তবে একটিমাত্র ভাবেই আমি তাঁহার উপাসনা করিতে পারিব, অর্থাৎ আমায় তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াই উপাসনা করিতে হইবে, অন্য কোনরূপে আমার তাঁহাকে উপাসনা করিবার উপায় নাই। আপনারা কি বলিতে চান, আমাদের ওরূপে তাঁহাকে উপাসনা করিবার অধিকার নাই? যদি আমরা তাঁহাকে আমাদের সমান ভূমিতে টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে কেবল একজন মহাপুরুষমাত্র বলিয়া একটু সম্মান দেখাই, তবে আর আমাদের তাঁহাকে উপাসনা করিবারই বা প্রয়োজন কি?

আমাদের শাস্ত্র বলেন,—"এই জ্যোতির তনয়গণ, যাঁহাদের ভিতর দিয়া সেই ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা স্বয়ং সেই জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহারা উপাসিত হইলে যেন আমাদের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং আমরাও তাঁহাদের সহিত এক হইয়া যাই।"

কারণ, আপনারা এটি লক্ষ্য করিলেন যে, মানব ত্রিবিধভাবে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় অশিক্ষিত মানবের অপরিণত বুদ্ধিতে বোধ হয় যে, ঈশ্বর বহুদূরে ঊর্দ্ধে স্বর্গনামক স্থানবিশেষে সিংহাসনে পাপপুণ্যের মহাবিচারকরূপে সমাসীন রহিয়াছেন। লোকে তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" স্বরূপে দর্শন করে। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এবংবিধ ধারণাও ভাল, ইহাতে মন্দ কিছুই নাই। আপনাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, মানব মিথ্যা হইতে—ভ্রম হইতে সত্যে অগ্রসর হয়, তাহা নহে, এক সত্য হইতে ক্রমে অপর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। যদি আপনারা পছন্দ করেন ত বলিতে পারেন, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ভ্রম হইতে—মিথ্যা হইতে সত্যে গমন করে, একথা কখনই বলিতে পারেন না। মনে করুন, আপনি এখান হইতে সূর্য্যাভিমুখে সরলরেখায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখান হইতে সূর্য্যকে অতি ক্ষুদ্রাকার দেখায়। মনে করুন, আপনি এখান হইতে দশ লক্ষ মাইল অগ্রসর হইলেন—সেখানে গিয়া সূর্য্যকে এখানকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারে দেখিবেন। যতই অগ্রসর হইবেন, ততই উহাকে বৃহত্তররূপে দেখিতে থাকিবেন। মনে করুন, এইরূপ বিভিন্ন

স্থান হইতে সূর্য্যের বিশ সহস্র আলোকচিত্র গ্রহণ করা গেল—ইহাদের প্রত্যেকটি যে অপরটি হইতে পৃথক্ হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহাদের সকলগুলিই যে সেই এক সূর্য্যেরই আলোকচিত্র, ইহা কি আপনি অস্বীকার করিতে পারেন? এইরূপ উচ্চতর বা নিম্নতর সর্ব্ববিধ ধর্ম্মপ্রণালীই সেই অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিবার বিভিন্ন সোপানাবলিমাত্র। কোন কোন ধর্ম্মে ঈশ্বরের ধারণা নিম্নতর, কোন কোন ধর্ম্মে উচ্চতর—এইমাত্র প্রভেদ। এই কারণেই সমগ্র জগতের গভীর-চিন্তাক্ষম জনসাধারণের ধর্ম্মে, ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে স্বর্গনামক স্থানবিশেষ অবস্থান করিয়া জগৎশাসনকারী, পুণ্যবানের পুরস্কার ও পাপীর দণ্ডদাতা এবং এতদ্বিধ অন্যান্য গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের ধারণা থাকিবেই এবং বরাবরই রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মানব অধ্যাত্মরাজ্যে যতই অগ্রসর হয়, ততই সে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে যে, যে ঈশ্বরকে সে এতদিন স্বর্গনামক স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ মনে করিতেছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিশ্চয় সর্ব্বত্র অবস্থিত, তিনি দূরে অবস্থিত নহেন, তিনি তাহারই মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি স্পষ্টতঃই সকল আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। যেমন আমার আত্মা আমার দেহকে পরিচালনা করিতেছেন, তদ্রূপ ঈশ্বর আমার আত্মারও পরিচালক, আত্মারও নিয়ন্তাস্বরূপ—তিনি আমাদের আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মাস্বরূপ। আবার কতকগুলি ব্যক্তি এতদূর চিত্তশুদ্ধি সাধন করিলেন ও আধ্যাত্মিকতায় এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধারণা অতিক্রম করিয়া আরও অগ্রসর হইয়া অবশেষে ঈশ্বরলাভ

করিলেন। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে নিম্নলিখিত বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়,—"পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণ ধন্য; কারণ, তাঁহারা ঈশ্বর দর্শন করিবেন।" আর অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারা এবং পিতা ঈশ্বর অভিন্ন।

আপনারা দেখিবেন, বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট অংশে এই মহান্ ধর্ম্মাচার্য্য উক্ত ত্রিবিধ সোপানের উপযোগী সাধন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি যে 'সাধারণ প্রার্থনা' (Common Prayer) শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেইটি লক্ষ্য করিয়া দেখুন—"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম জয়যুক্ত হউক" ইত্যাদি। ইহা সাদাসিধা ভাবের প্রার্থনা, শিশুর প্রার্থনা। এটি লক্ষ্য করিবেন যে, ইহা "সাধারণ প্রার্থনা"; কারণ, ইহা অশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য বিহিত। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যক্তিদের জন্য, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য তিনি অপেক্ষাকৃত উন্নত সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার নিম্ন-লিখিত উক্তিতে তাহার আভাস পাওয়া যায়—"আমি আমার পিতাতে, তোমরা আমাতে, এবং আমি তোমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান।" স্মরণ হইতেছে ত? আর যখন য়াহুদীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আপনি কে? তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,— "আমি ও আমার পিতা এক।" য়াহুদীরা মনে করিয়াছিল, তিনি ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অভিন্ন ঘোষণা করিয়া ঘোরতর ভগবন্নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু তিনি উক্ত বাক্য কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন? তাহাও আপনাদের প্রাচীন 'প্রফেট্'গণ (ভবিষ্যদ্দর্শী মহাপুরুষগণ) বলিয়া গিয়াছেন—"তোমরা সকলেই দেব বা ঈশ্বর—

তোমরা সকলেই সেই পরাৎপর পুরুষের সন্তান।" অতএব দেখুন, বাইবেলেও এই ত্রিবিধ সোপান স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট রহিয়াছে, আর আপনারা ইহাও দেখিবেন যে, আপনাদের পক্ষে উক্ত প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে শেষ সোপানে গমন করাই অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই ঈশ্বরের অগ্রদূত, এই সুসমাচারবাহক যীশু সত্যলাভের পথ দেখাইতে আসিয়াছিলেন। তিনি দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানারূপ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদির দ্বারা সেই যথার্থ তত্ত্ব—আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না; দেখাইতে আসিয়াছিলেন যে, নানাবিধ কূট, জটিল দার্শনিক বিচারের দ্বারা সেই আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। আপনার যদি কিছুমাত্র বিদ্যা না থাকে, সে ত বরং আরও ভাল; আপনি সারা জীবনে যদি একখানি বইও না পড়িয়া থাকেন, সে ত আরও ভাল কথা। এ সকল আপনার মুক্তির জন্য একেবারেই আবশ্যক নহে, মুক্তিলাভের জন্য ঐশ্বর্য্য, বৈভব, উচ্চপদ বা প্রভুত্বের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই—এমন কি, পাণ্ডিত্যেরও কিছু প্রয়োজন নাই। কেবল একটি জিনিসের প্রয়োজন—তাহা এই—পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি। "পবিত্রাত্মা বা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ধন্য,"—কারণ, আত্মা স্বয়ং শুদ্ধস্বভাব। উহা অন্যরূপ অর্থাৎ অশুদ্ধ কিরূপে হইতে পারে? উহা ঈশ্বরপ্রসূত—ঈশ্বর হইতে উহার আবির্ভাব। বাইবেলের ভাষায়, উহা "ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ," কোরাণের ভাষায়, উহা "ঈশ্বরের আত্মাস্বরূপ।" আপনারা কি বলিতে চান, এই ঈশ্বরাত্মা কখনও অপবিত্র হইতে পারে? কিন্তু হায়, আমাদেরই শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা উহা যেন শত শত শতাব্দীর

ধূলি ও মলের দ্বারা আবৃত হইয়াছে। নানাবিধ অন্যায় কর্ম্ম, নানাবিধ অশুভ কর্ম্ম সেই আত্মাকে শত শত শতাব্দীর অজ্ঞানরূপ ধূলি ও মলিনতা দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। আবশ্যক কেবল ঐ ধূলি ও মল অপসারণ,—তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আত্মা আপন প্রভায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। "শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ, তাহারা ঈশ্বরদর্শন করিবে।" স্বর্গরাজ্য তোমাদের অভ্যন্তরেই বিরাজমান। সেই ন্যাজারেথবাসী যীশু আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "যখন সেই স্বর্গরাজ্য এখানেই, তোমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, তখন আবার উহার অন্বেষণের জন্য কোথা যাইতেছ? আত্মার উপরিভাগে যে মলিনতা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া ফেল, উহা এখানেই বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে। উহা পূর্ব্ব হইতেই তোমার সম্পত্তি। যাহা তোমার নহে, তাহা তুমি কি করিয়া পাইবে? উহা তোমার জন্মপ্রাপ্ত অধিকারস্বরূপ। তোমরা অমৃতের অধিকারী, সেই নিত্য সনাতন পিতার তনয়।"

ইহাই সেই সুসমাচার-বাহী যীশুখ্রীষ্টের মহতী শিক্ষা—তাঁহার অপর শিক্ষা—ত্যাগ; উহা সকল ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। আত্মাকে বিশুদ্ধ কি করিয়া করিবে?—ত্যাগের দ্বারা। জনৈক ধনী যুবক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"প্রভো, অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে?" যীশু তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার এখনও একটি অভাব আছে। যাও বাড়ী যাও, তোমার যাহা কিছু আছে সব বিক্রয় কর, ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রগণকে বিতরণ কর—তাহা হইলে স্বর্গে তুমি অক্ষয় সম্পদ্ সঞ্চয় করিবে। তার পর আসিয়া ক্রুশ গ্রহণ করিয়া আমার

অনুসরণ কর।" ধনী যুবকটি যীশুর এই উপদেশে দুঃখিত হইল এবং বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার অগাধ সম্পত্তি ছিল। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর ঐ ধনী যুবকের মত। দিবারাত্র আমাদের কর্ণে সেই মহবাণী ধ্বনিত হইতেছে। আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যে, সাংসারিক বিষয় ভোগের মধ্যে আমরা মনে করি, আমরা জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সব ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু উহার মধ্যেই হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের বিরাম আসিল—সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল—"তোমার যাহা কিছু আছে সব ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ কর।" "যে কোন ব্যক্তি নিজের জীবনরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে সে উহা হারাইবে, আর যে আমার জন্য নিজের জীবন হারাইবে সে উহা পাইবে।" কারণ, যে কোন ব্যক্তি তাঁহার জন্য এই জীবন বিসর্জ্জন করিবে, সে অমৃতত্ব লাভ করিবে। আমাদের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতার মধ্যে—সর্ব্ববিধ কার্য্যকলাপের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কখনও কখনও যেন একটু বিরাম আসিয়া উপস্থিত হয়, আর সেই মহাবাণী আমাদের কর্ণে ঘোষণা করিতে থাকে—"তোমার যাহা কিছু আছে সব ত্যাগ করিয়া দরিদ্রদিগকে উহা বিতরণ কর এবং আমার অনুসরণ কর।" তিনি ঐ এক আদর্শ প্রচার করিতেছেন—জগতের সকল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণও ঐ এক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। তাহা এই—ত্যাগ। এই ত্যাগের তাৎপর্য্য কি? ত্যাগের মর্ম্ম এই—নীতি-বিজ্ঞানে নিঃস্বার্থপরতাই একমাত্র আদর্শ। অহংশূন্য হও। পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা বা অহংশূন্যতাই আমাদের একমাত্র আদর্শ। এই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত এই যে, ডান গালে চড় মারিলে বাঁ

গাল ফিরাইয়া দিতে হইবে—যদি কেহ তোমার জামা কাড়িয়া লয়, তাহাকে তোমার চাপকানটিও খুলিয়া দিতে হইবে।

আদর্শকে খাট না করিয়া যতদূর পারা যায় উত্তমরূপে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। আর সেই আদর্শ অবস্থা এই,—যে অবস্থায় মানুষের অহংভাব কিছুমাত্র থাকে না, তাহার যখন কোন বস্তুতে অধিকার থাকে না, তাহার যখন 'আমি' 'আমার' বলিবার কিছু থাকে না, সে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করে, যেন নিজেকে মারিয়া ফেলে। আর এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির ভিতর স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজমান। কারণ, তাহার ভিতর হইতে অহং-বাসনা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে, একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। আমরা এখনও সেই আদর্শে পঁহুছিতে পারিতেছি না, তথাপি আমাদিগকে ঐ আদর্শের উপাসনা করিতে হইবে, এবং ধীরে ধীরে ঐ আদর্শে পঁহুছিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, যদিও উহাতে আমাদিগকে স্খলিতপদে অগ্রসর হইতে হয়। কল্যই হউক আর সহস্র বর্ষ পরেই হউক, ঐ আদর্শ অবস্থায় পঁহুছিতেই হইবে। কারণ, উহা শুধু আমাদের লক্ষ্য নহে, উহা উপায়ও বটে। নিঃস্বার্থপরতা সম্পূর্ণভাবে অহংশূন্যতাই সাক্ষাৎ মুক্তিস্বরূপ; কারণ, অহং ত্যাগ হইলে ভিতরের মানুষ মরিয়া যায়, একমাত্র ঈশ্বরই অবশিষ্ট থাকেন।

আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায়, মানবজাতির সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণই সম্পূর্ণরূপে স্বার্থশূন্য। মনে করুন, ন্যাজারেথবাসী যীশু উপদেশ দিতেছেন—কোন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—"আপনি যাহা উপদেশ করিতেছেন, তাহা অতি সুন্দর; আমি

বিশ্বাস করি, ইহাই পূর্ণতালাভের উপায়, আর আমি উঁহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমি আপনাকে ঈশ্বরের একমাত্র উৎপন্ন পুত্র বলিয়া উপাসনা করিতে পারিব না"—তাহা হইলে সেই ন্যাজারেথবাসী যীশু কি উত্তর দিবেন, মনে করেন? তিনি নিশ্চিত উত্তর দিবেন,—"বেশ ভাই, তুমি আদর্শের অনুসরণ কর, এবং নিজের ভাবে উহার দিকে অগ্রসর হও। তুমি ঐ উপদেশের জন্য আমাকে প্রশংসা কর না কর তাহাতে আমার কিছু আসিয়া যায় না। আমি ত দোকানদার নহি—আমি ধর্ম্ম লইয়া ব্যবসা করিতেছি না। আমি কেবল সত্য শিক্ষা দিয়া থাকি, আর সত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। সত্যকে একচেটিয়া করিবার কাহারও অধিকার নাই। সত্য স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ। তুমি নিজ পথে অগ্রসর হইয়া চল।" কিন্তু শিষ্যেরা এক্ষণে কি বলেন?—তাঁহারা বলেন—তোমরা তাঁহার উপদেশের অনুসরণ কর না কর, উপদেষ্টাকে যথাযথ সম্মান দিতেছ কি না? যদি উপদেষ্টার—আচার্য্যের সম্মান কর, তবেই তুমি উদ্ধার হইবে; নতুবা তোমার মুক্তি নাই।" এইরূপে এই আচার্য্যবরের সমুদয় উপদেশই বিগ্ড়াইয়া গিয়াছে। এখন দাঁড়াইয়াছে কেবল উপদেষ্টা মানুষটাকে লইয়া বিবাদ। তাহারা জানে না যে, এইরূপে উপদেশের অনুসরণ ছাড়িয়া দিয়া, উপদেষ্টার নাম লইয়া টানাটানি করাতে তাহারা যে ব্যক্তিকে সম্মান করিতে চাহিতেছে, একভাবে তাঁহাকেই অপমান করিতেছে —ঐরূপে তাঁহার উপদেশ ভুলিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে গেলে তিনি নিজেই লজ্জায় মহা সঙ্কুচিত হইতেন। জগতের কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মনে রাখিল না রাখিল, ইহাতে তাঁহার কি আসিয়া যায়,

তাঁহার জগতের নিকট একটি বার্ত্তা—একটি সুসমাচার বহন করিবার ছিল—তিনি তাহা বহন করিয়াই নিশ্চিন্ত। বিশ সহস্র জীবন পাইলেও তিনি তাহা জগতের দরিদ্রতম ব্যক্তির জন্য প্রদানে প্রস্তুত ছিলেন। যদি লক্ষ লক্ষ ঘৃণিত সামারিয়াবাসীর জন্য লক্ষ লক্ষ বার তাঁহাকে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত, এবং তাহাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁহার জীবন বলিই যদি তাহাদের মুক্তির একমাত্র উপায় হইত, তবে তিনি অনায়াসে তাঁহার জীবন বলি দিতেই প্রস্তুত হইতেন। এই সকলই তিনি করিতেন—ইহাতে এক ব্যক্তির নিকটও তাঁহার নিজ নাম জানাইবার ইচ্ছা হইত না। স্বয়ং প্রভু ভগবান্ যে ভাবে কার্য্য করেন, তিনিও সেইভাবে ধীর স্থির নীরব অজ্ঞাতভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাঁহার শিষ্যেরা এক্ষণে কি বলেন? তাঁহারা বলেন—তোমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও ও সর্ব্বদোষবর্জ্জিত হইতে পার, কিন্তু তোমরা যদি আমাদের আচার্য্যকে—আমাদের মহাপুরুষকে যথোপযুক্ত সম্মান না দাও, তাহা হইলে উহাতে কোন ফল নাই।—কেন? এই কুসংস্কার—এই ভ্রমের উৎপত্তি কোথা হইতে? এই ভ্রমের একমাত্র কারণ এই যে, যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যগণ মনে করেন,—ভগবান্ একবার মাত্রই আবির্ভূত হইতে সমর্থ। ঈশ্বর তোমার নিকট মানবরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র প্রকৃতিতে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা নিশ্চিত অতীতকালে বহুবার সংঘটিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চিন্ত ঘটিবে। প্রকৃতিতে এমন কিছু নাই, যাহা নিয়মাধীন নহে; আর নিয়মাধীন হওয়ার অর্থ এই যে, যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিতে থাকিবে।

ভারতেও এই অবতারবাদ রহিয়াছে। ভারতীয় অবতারশ্রেষ্ঠ-গণের অন্যতম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (যাঁহার ভগবদ্গীতারূপ অপূর্ব্ব উপদেশমালা আপনারা অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন) বলিতেছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।—গীতা, ৪।৬—৮

অর্থাৎ, যদিও আমি জন্মরহিত, অক্ষয়স্বভাব এবং ভূতসমূহের ঈশ্বর, তথাপি আমি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া, নিজ মায়ায় জন্মগ্রহণ করি, হে অর্জ্জুন, যথনই যথনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তথনই তথনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য, আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।

যথনই জগতের অবনতিদশা সংঘটিত হয়, তথনই ভগবান্ উহাকে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আর এক-স্থানে তিনি এই ভাবের কথা বলিয়াছেন—যথনই দেখিবে, কোন মহাশক্তিসম্পন্ন পবিত্রস্বভাব মহাত্মা মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, জানিও, তিনি আমারই তেজসম্ভূত, আমি তাঁহার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছি। *

* যদ্‌ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ গীতা, ১০।৪১

অতএব আসুন, আমরা শুধু ন্যাজারেথবাসী যীশুর ভিতর ভগবান্‌কে দর্শন না করিয়া তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরে যাঁহারা আসিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও যাঁহারা আসিবেন, সেই সকলেরই ভিতর ঈশ্বর দর্শন করি। আমাদের উপাসনা যেন সীমাবদ্ধ না হয়। সকলেই সেই এক অনন্ত ঈশ্বরেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তিমাত্র। তাঁহারা সকলেই পবিত্রাত্মা ও স্বার্থগন্ধহীন। তাঁহারা সকলেই এই দুর্ব্বল মানবজাতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং জীবন দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের সকলের জন্য, এমন কি, ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য পর্য্যন্ত সকলের পাপ গ্রহণ করিয়া নিজেরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

এক হিসাবে আপনারা সকলেই অবতার—সকলেই নিজ নিজ স্কন্ধে জগতের ভারবহন করিতেছেন। আপনারা কি কখনও এমন নরনারী দেখিয়াছেন, যাহাকে শান্তভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত নিজ জীবনভার বহন করিতে না হয়? বড় বড় অবতারগণ অবশ্য আমাদের তুলনায় অনেক বড় ছিলেন—সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের স্কন্ধে প্রকাণ্ড জগতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমরা অতিক্ষুদ্র, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরাও সেই একই কর্ম্ম করিতেছি—আমাদের ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে, আমাদের ক্ষুদ্র গৃহে আমরা আমাদের সুখদুঃখরাজি বহন করিয়া চলিয়াছি। এমন মন্দপ্রকৃতি, এমন অপদার্থ কেহ নাই, যাহাকে নিজ নিজ ভার কিছু না কিছু বহন করিতে হয়। আমাদের ভুল ভ্রান্তি যতই থাকুক, আমাদের মন্দ চিন্তা ও মন্দ কর্ম্মের পরিমাণ যতই হউক, আমাদের চরিত্রের কোন না কোনখানে এমন এক উজ্জ্বল অংশ আছে, কোন না কোনখানে

এমন এক সুবর্ণসূত্র আছে, যাহা দ্বারা আমরা সর্ব্বদা সেই ভগবানের সহিত সংযুক্ত। কারণ, নিশ্চিত জানিবেন, যে মুহূর্ত্তে ভগবানের সহিত আমাদের এই সংযোগ নষ্ট হইবে সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর যেহেতু কাহারও কখনও সম্পূর্ণ বিনাশ হইতে পারে না, সেইহেতু আমরা যতই হীন ও অবনত হই না কেন, আমাদের অন্তরের অন্তরতম স্থানের কোন না কোন গুপ্ত প্রদেশে এমন একটি ক্ষুদ্র জ্যোতির্ম্ময় বৃত্ত রহিয়াছে, যাহার সহিত ভগবানের নিত্যযোগ রহিয়াছে।

বিভিন্নদেশীয়, বিভিন্নজাতীয় ও বিভিন্নমতাবলম্বী যে সকল অবতারগণের জীবন ও শিক্ষা আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ; বিভিন্ন জাতীয় যে সকল দেবতুল্য নরনারী মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম। জীবন্ত ঈশ্বরস্বরূপ যাঁহারা আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম।

ভগবান্ বুদ্ধ

(আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ডিট্রয়েট নামক স্থানে এক বক্তৃতার ভিতর স্বামীজি ভগবান্ বুদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন)

প্রত্যেক ধর্ম্মে আমরা এক এক প্রকার সাধন বিশেষের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মে নিষ্কাম কর্ম্মের ভাবটাই খুব বেশী প্রবল। আপনারা বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে গোল করিয়া ফেলিবেন না—এদেশে অনেকেই ঐরূপ গোল করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, উহা সনাতন ধর্ম্মের সহিত সংযোগহীন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম্ম; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, উহা সনাতন ধর্ম্মেরই সম্প্রদায়বিশেষ মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম গৌতম নামক মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত—তিনি তাৎকালিক অনবরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠানপদ্ধতি, বিশেষতঃ জাতি-ভেদের উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, আমরা এক বিশেষ কুলে জন্মিয়াছি—সুতরাং যাহারা এরূপ বংশে জন্মে নাই, তাহাদের অপেক্ষা আমরা শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ বুদ্ধ জাতি-ভেদের এইরূপ ব্যাখ্যার বিরোধী ছিলেন। তিনি আবার পুরোহিতগণের ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ছলে কৌশলে স্বার্থ সিদ্ধির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, যাহাতে সকামভাবের লেশমাত্র ছিল না, আর তিনি দর্শন ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নানাবিধ মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহিতেন না—ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। অনেকে অনেক সময় তাঁহাকে ঈশ্বর আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিতেন—তিনি উত্তর

দিতেন, ওসব বিষয়ে আমি কিছু জানি না। মানবের প্রকৃত কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, সচ্চরিত্র হও ও অপরের কল্যাণ সাধন কর। একবার তাঁহার নিকট পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের তর্কের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। একজন বলিলেন, "ভগবন্, আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে এই এই কথা আছে।" অপরে বলিলেন, "না, না, ও কথা ভুল; কারণ আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহাকে লাভ করিবার সাধন অন্য প্রকার বলিয়াছে।" এইরূপে অপরেও ঈশ্বরস্বরূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বিভিন্ন অভিপ্রায়-সমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেকের কথা বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিয়া প্রত্যেককে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা আপনাদের কাহারও শাস্ত্রে কি একথা বলে যে, ঈশ্বর ক্রোধী, হিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র?"

ব্রাহ্মণেরা সকলেই বলিলেন, "না, ভগবন্, সকল শাস্ত্রেই বলে 'ঈশ্বর শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ'।" ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, "বন্ধুগণ, তবে আপনারা কেন প্রথমে শুদ্ধ ও সাধুস্বভাব হইবার চেষ্টা করুন না, যাহাতে আপনারা ঈশ্বর কি বস্তু জানিতে পারেন।"

অবশ্য আমি তাঁহার সকল মতের সমর্থন করি না। আমার নিজের জন্যই আমি দার্শনিক বিচারের যথেষ্ট আবশ্যকতা বোধ করি। অনেক বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার সম্পূর্ণ মতভেদ আছে, কিন্তু মতভেদ আছে বলিয়াই যে আমি তাঁহার চরিত্রের, তাঁহার ভাবের সৌন্দর্য্য দেখিব না, ইহার কি কোন অর্থ আছে?

জগতের আচার্য্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্য্যের কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই আপনাদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধ মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, "কেহই তোমাকে মুক্ত হইবার সাহায্য করিতে পারে না—আপনার সাহায্য আপনি কর—নিজ চেষ্টা দ্বারা নিজ মুক্তি সাধনের চেষ্টা কর।" নিজের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "বুদ্ধ শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্ত-জ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি—তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিবে।" তিনি সর্ব্ববিধ কামনা ও অভিসন্ধিবিবর্জ্জিত ছিলেন, সুতরাং তিনি স্বর্গে গমনের বা ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তিনি রাজ-সিংহাসনের আশা ও সর্ব্ববিধ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভারতের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদর পূরণ করিতেন এবং সমুদ্রবৎ প্রশস্ত হৃদয় লইয়া নরনারী ও অন্যান্য জীবজন্তুর কল্যাণ যাহাতে হয়, তাহাই প্রচার করিতেন। জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, তিনি যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণোদ্দেশ্যে পশুগণের পরিবর্ত্তে নিজ জীবন বিসর্জ্জনে সতত প্রস্তুত ছিলেন। তিনি একবার জনৈক রাজাকে বলিয়াছিলেন, "যদি যজ্ঞে মেষ হত্যা করিলে আপনার স্বর্গ গমনের সহায়তা হয়, তবে নরহত্যা করিলে তাহাতে ত আরও অধিক উপকার হইবে—অতএব যজ্ঞস্থলে আমায় বধ করুন।" রাজা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অথচ এ ব্যক্তি

সর্ব্ববিধ অভিসন্ধিবর্জ্জিত ছিলেন। তিনি কর্ম্মযোগীর আদর্শস্বরূপ ছিলেন, আর তিনি যে উচ্চাবস্থায় আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ বুঝা যায়, কর্ম্মবলে আমরাও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারি।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোনরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, যদি সে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতে গমন না করে, এমন কি, প্রকাশ্যতঃ নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা লাভে সমর্থ। তাঁহার মতামত বা কার্য্যকলাপ বিচার করিবার আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব্ব হৃদয়বত্তার লক্ষাংশের একাংশেও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজকে ধন্য জ্ঞান করিতাম। হইতে পারে, বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হইতে পারে, বিশ্বাস করিতেন না—তাহাতে আমার কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাহা লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্ম্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখীকেও যাহা শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই আবৃত্তি করিতে পারে। কিন্তু কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে করিতে পারিলেই তাহার বলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

পুস্তক		সাধারণের পক্ষে	উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে
বাঙ্গলা রাজযোগ	(৯ম সংস্করণ)	১।৹	১৵৹
" জ্ঞানযোগ	(১১শ সং)	১॥৹	১।৵৹
" ভক্তিযোগ	(১২শ সং)	৸৹	॥৵৹
" কর্ম্মযোগ	(১৩শ সং)	৸৹	॥৵৹
" পত্রাবলী (পাঁচ খণ্ড) প্রতিখণ্ড		॥৵৹	॥৹
" দেববাণী	(৪র্থ সং)	১৲	৸৵৹
" বীরবাণী	(৯ম সং)	।৵৹	।৵৹
" ধর্ম্মবিজ্ঞান	(৩য় সং)	৸৹	॥৵৹
" কথোপকথন	(৩য় সং)	॥৵৹	॥৹
" ভক্তি-রহস্য	(৬ষ্ঠ সং)	৸৹	॥৵৹
" চিকাগো বক্তৃতা	(৯ম সং)	।৵৹	।৵৹
" ভাব্‌বার কথা	(৭ম সং)	॥৹	।৵৹
" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	(১০ম সং)	॥৹	।৵৹
" পরিব্রাজক	(৬ষ্ঠ সং)	৸৹	॥৵৹
" ভারতে বিবেকানন্দ	(৮ম সং)	১৸৹	১॥৵৹
" বর্ত্তমান ভারত	(৭ম সং)	।৵৹	।৵৹
" মদীয় আচার্য্যদেব	(৫ম সং)	।৵৹	।৵৹
" বিবেক-বাণী	(১০ম সং)	৵৹	৵৹
" পওহারী বাবা	(৫ম সং)	৶৹	৵১৹
" হিন্দুধর্ম্মের নব জাগরণ	(২য় সং)	।৵৹	।৵৹
" মহাপুরুষ প্রসঙ্গ	(৬ষ্ঠ সং)	॥৵৹	॥৹
" ভারতীয় নারী	৩য় সং)	৸৹	॥৵৹
" সন্ন্যাসীর গীতি	(৯ম সং)	৴৹	৴৹
" ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট	২য় সং)	৵৹	৴১৹
" স্বামিজীর কথা		৸৹	॥৵৹

ধর্ম্মপ্রসঙ্গে—স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথোপকথন এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনকথা সম্বলিত। মূল্য—১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত—১৩শ সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ও দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ছবি যুক্ত। পকেট সংস্করণ—কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ।৵৹ আনা।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্‌গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইয়াছিলেন, সে ভাবটি বর্ত্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া অসম্ভব; কারণ, ইহা তাঁহাদেরই অন্যতমের দ্বারা লিখিত।

পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষয়গুলি ঐ পৃষ্ঠার পার্শ্বে 'মার্জ্জিন্যাল নোট'রূপে দেওয়া হইয়াছে। আবার ঐ নোট-সম্বলিত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তারিত সূচীপত্র গ্রন্থের প্রথমে দিয়া পুস্তক-মধ্যগত কোন বিষয় খুঁজিয়া লইতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

		সাধারণ মূল্য	উদ্বোধন গ্রাহক-পক্ষে
১ম খণ্ড—পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন—	৪র্থ সংস্করণ—	১৶০	১৲
২য় খণ্ড—সাধকভাব—	৫ম সংস্করণ—	১॥০	১৶০
৩য় খণ্ড—গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ—	৫ম সংস্করণ—	১॥০	১৶০
৪র্থ খণ্ড—গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ—	৪র্থ সংস্করণ—	১॥০	১৶০
৫ম খণ্ড—দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ—	৪র্থ সংস্করণ—	১॥৶০	১॥০

ভারতে শক্তিপূজা—(৫ম সংস্করণ) স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। উত্তম বাঁধাই ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ॥০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ।৶০ আনা। শক্তি পূজার মূল তাৎপর্য্য কি এবং যে সকল বিভিন্ন প্রতীকাবলম্বনে শক্তিপূজা হইতে পারে, তন্মধ্যে কয়েকটি তত্ত্ব এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। গীতা-ভাব-ঘন-মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব্ব দেব-জীবনের মধ্য দিয়া গীতাতত্ত্বব্যাখ্যা করিয়া বক্তা সকল মানবকে বীর্য্য ও বলসম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উত্তম বাধাই, এন্টিক কাগজে ছাপা, মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র, উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ১।৶০ আনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতা সংগ্রহের ২য় পুস্তক। এখানিও সুধীসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে ॥৶০ আনা।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

১ম ভাগ—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত (৩য় সংস্করণ), ২য় ভাগ—নূতন সংস্করণ। শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডাইরী হইতে সংগৃহীত। শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সারগর্ভ উপদেশ—সংসারের শোকতাপে সান্ত্বনাদায়ক এবং অধ্যাত্মরাজ্যে পথ প্রদর্শক। প্রথমভাগে ছয়খানি ছবি ও ৩৭০ পৃষ্ঠা এবং ২য় ভাগে তিনখানি ছবি ও ৪৫২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সুন্দর বাঁধাই—প্রতিখণ্ড—২৲ টাকা।

বিবেকানন্দ চরিত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত

পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত ৪র্থ সংস্করণ। এন্টিক কাগজে ছাপা, মজবুত কাপড়ের সুন্দর বাঁধাই, ৫৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য তিন টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান শতাব্দীর চিন্তারাজ্যের অপ্রতিহত যোদ্ধা স্বামী বিবেকানন্দের এই জীবনচরিতখানি সুধীসমাজে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে আলোড়িত ভারতবর্ষের জাতীয় আদর্শ নানা বিকৃতির মধ্য হইতে এই শক্তিশালী সন্ন্যাসী কি উপায়ে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা যথোচিত যত্নসহকারে জীবনের বিকাশের স্তরে স্তরে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক মনীষিগণের প্রচারিত আদর্শের সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া জীবন-বিশ্লেষণ বাঙ্গলা-সাহিত্যে এই প্রথম। এই কার্য্যে গ্রন্থকার কতটা সফল হইয়াছেন, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য।

স্বামীজির সহিত হিমালয়ে—সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত—"Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। ২য় সংস্করণ। এই পুস্তকে পাঠক স্বামিজীর বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন;—ইহা নিবেদিতার ডায়েরী হইতে লিখিত। সুন্দর বাঁধন, মূল্য ॥৹ আনা মাত্র।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত—(পঞ্চম সংস্করণ)। স্বামীজি ও বর্ত্তমানকালে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা সমস্যামূলক বিষয় সকল, তাঁহার মতামত সংক্ষেপে জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপূর্ব্বে আর কখন পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা।

तन्नो हंसः प्रचोदयात्